আখের গুড়ে শালুকডাঁটা

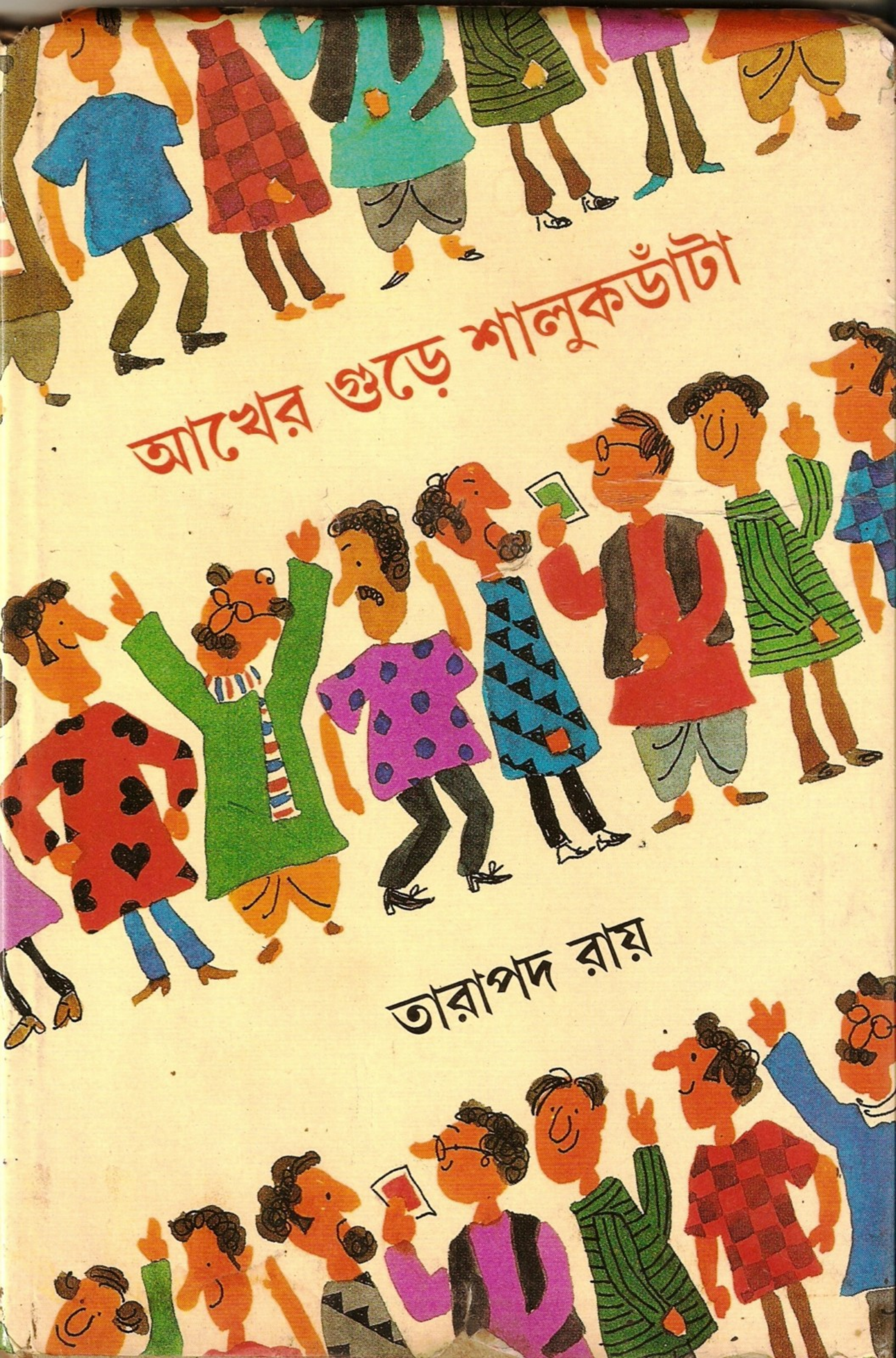

তারাপদ রায়

আখের গুড়ে শালুকডাঁটা

তারাপদ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

সূচীপত্র

আখের গুড়ে শালুকডাঁটা ৯
হরেরাম ৮০
উকিঝুঁকি ১০৫

আখের গুড়ে শালুকডাঁটা

উপক্রমণিকা

'রঘুনাথপুর দর্পণ।' দর্পণ মানে আয়না।

রঘুনাথপুর দর্পণ মানে রঘুনাথপুরের আয়না।

রঘুনাথপুর দর্পণ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পুরো নাম অবশ্য 'সচিত্র রঘুনাথপুর দর্পণ, সংবাদ সাপ্তাহিক'। তবে সচিত্র হলেও কাগজে ছবি খুব বেশি থাকে না। দু-চারটে পুরনো ছবির ব্লক আছে তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাপা হয়।

নতুন ছবি ছাপানো কঠিন ব্যাপার। সবার আগে চাই ড্রইং অথবা ফোটো, সেটা রঘুনাথপুরের মতো সামান্য গ্রামগঞ্জে সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তারপরে বহুকষ্টে যদিও বা জোগাড় করা গেল সেটাকে ব্লক না করে ছাপানো যাবে না। ব্লক বানাতে যেতে হবে সেই কলকাতায় বউবাজারে বা চিতপুরে। বউবাজারেই সুবিধে, কারণ জায়গাটা শেয়ালদার কছে, আর তা ছাড়া সেখানে খরচাও কিছু কম পড়ে।

রঘুনাথপুর থেকে শেয়ালদা ট্রেনে ঠিক ঊনপঞ্চাশ কিলোমিটার, পুরনো হিসেবে তিরিশ মাইল। আগে ভাড়া ছিল মাত্র আট আনা বা পঞ্চাশ পয়সা। এখন সেই ভাড়াই চার টাকা হয়েছে। অনেকেই টিকিট কাটে না, যারা টিকিট না কেটে যেতে সাহস পায় না তাদের গায়ে ভাড়াটা খুব লাগে।

এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। রঘুনাথপুরে কোনও স্টেশন নেই, যদিও জায়গাটা রেললাইনের পাশে। রেললাইনের পাশ দিয়ে গেছে আদ্যিকালের জেলাবোর্ডের রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে এক ক্রোশের মতো মানে তিন কিলোমিটারের মতো পথ গেলে তবে কালিয়াপুর স্টেশন।

রঘুনাথপুর শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে চিরকালই কালিয়াপুরের

অনেক ওপরে, অন্তত রঘুনাথপুরের লোকেরা তাই মনে করত এবং এখনও তাই মনে করে। কালিয়াপুরের লোকেরা কী ভাবত বলা কঠিন, কারণ বছর-পঞ্চাশেক হল একটা এনামেলের কারখানা কালিয়াপুরকে গ্রাস করে নিয়েছে। সেখানকার পুরনো লোকেরা এখন আর কোথাও নেই।

তবে যখন রঘুনাথপুরের বদলে কালিয়াপুরে রেলের স্টেশন হয়েছিল সে-সময় কালিয়াপুরও বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। সেই সময় কালিয়াপুরের সরকারেরা খুব ক্ষমতাবান ছিল। তারা রেলের বড়সাহেবকে কালিয়াপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে নানারকম খাতির-যত্ন করে স্টেশনটা যাতে রঘুনাথপুরে না হয়ে কালিয়াপুরে হয় তার ব্যবস্থা করে।

সেই সরকারেরা কবে তাদের জমিজমা, বাড়িঘর এনামেল কম্পানির কাছে বেচে দিয়ে কলকাতায় উঠে গেছে। তারা যে পুকুরের মাছ ধরে বড়সাহেবকে খাইয়েছিল সে-পুকুর কবে বোজানো হয়ে গেছে, এখন আর কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। এমনকী, সেই পুকুরপাড়ের গোপালভোগ আমগাছের বাগান, যে গাছের আম বড়সাহেব তিন ঝুড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই বাগানও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানে তিরিশ বছর আগে এনামেল কম্পানির কুলির ব্যারাক হয়েছিল আর সে-ব্যারাকও বছর-দুয়েক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা আগুনে পুড়ে গেছে, এখন সেখানে উঠছে চারতলা কোয়ার্টার।

আর, রেললাইনের পাশে সেই পুরনো আদ্যিকালের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ধুলোভরা রাস্তা—যে রাস্তা দিয়ে চলত গোরুর গাড়ি, সাইকেল, কখনও কদাচিৎ দু-একটা ঘোড়ার গাড়ি, সেই রাস্তা দিয়ে এখন ছুটে যায় দূরপাল্লার বাস, রং-বেরঙের মোটর গাড়ি, স্কুটার, লরি, ট্রাক আর তারই পাশাপাশি বিপজ্জনকভাবে চলে সাইকেল, সাইকেল-রিকশ আর মানুষজন।

রঘুনাথপুর থেকে কলকাতায় যেতে গেলে এখনও এই পথ দিয়ে সাইকেল-রিকশয় অন্তত আধ ঘণ্টা লাগে। আর পায়ে হেঁটে গেলে এক ঘণ্টা পরে কালিয়াপুর স্টেশনে পৌঁছে তারপর ট্রেনে উঠতে হয়।

রঘুনাথপুর দর্পণ কোনও হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা ভুঁইফোড় কাগজ নয়।

pathagar.net

যদিও অনিয়মিত বেরোয় কিন্তু বেরোচ্ছে আর প্রায় তিরিশ বছর ধরে। যখন প্রথম বেরোয় তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচেছিলেন। তাঁর আশীর্বাণী ছাপা হয়েছিল প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায়। আর তখনও সেই আশীর্বাণী রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস ঘরের দেওয়ালে কাচ দিয়ে ফোটোর ফ্রেমে বাঁধানো আছে।

রঘুনাথপুর দর্পণ প্রকাশ করেছিলেন বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুপদ দাসের জ্যাঠামশাই, সম্প্রতি পরলোকগত অভয়পদ দাস।

অভয়পদবাবু দীর্ঘজীবী ছিলেন। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়েসে হাই ইস্কুলের হেডমাস্টারি থেকে অবসরগ্রহণ করার পরে তিনি এই রঘুনাথপুর দর্পণ বার করেন। মারা গেলেন এই তো মাত্র দেড় বছর আগে। সেই হিসেবে মৃত্যুর সময় অভয়পদবাবুর অন্তত তিরানব্বই বছর বয়েস হয়েছিল। তবে গুরুপদবাবু বলেন যে, তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়েসটা চার বছর বাড়ানো ছিল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় তাঁর বয়েস ছিল খুব কম। নিতান্ত বারো কিন্তু তখন ষোলো বছর বয়স না হলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি থেকে দিতে অনুমতি দিত না। সেইজন্য অভয়পদবাবুর বয়েস তখন বাড়িয়ে মিথ্যে করে ষোলো বছর করা হয়।

গুরুপদবাবুর এই কথা যদি সত্যি হয় তবে অভয়পদবাবুর মৃত্যুর সময় বয়েস হয়েছিল অষ্টাশি-ঊননব্বই। আর সেটাও কিছু কম নয়।

তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত রঘুনাথপুর দর্পণ যখন যা বেরিয়েছে অভয়পদবাবুর নামেই বেরিয়েছে। যদিও গুরুপদবাবু শেষের দিকে সদাসর্বদাই জ্যাঠামশাইকে সাহায্য করতেন এবং পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাগজে তাঁর নাম ছাপা হত, আগাগোড়াই সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন অভয়পদ দাস। শুধু তাই নয়, নিজস্ব রঘুনাথপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে কাগজ ছাপানো হত এবং সেই সূত্রে কাগজের মুদ্রাকর হিসেবেও নাম ছাপা হত অভয়পদবাবুর।

এখন অবশ্য গুরুপদবাবু নিজেই সম্পাদক হয়েছেন। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও কর্মাধ্যক্ষ হিসেবেও তাঁর নামই ছাপা হয়।

আজ কিছুদিন হল জয়ন্তলাল কর্মকার নামে একটি এম. এ. ফেল

উদীয়মান লেখককে গুরুপদবাবু নিযুক্ত করেছেন তাঁর কাজকর্মে সহায়তা করার জন্যে। তাঁকে লোভ দেখিয়েছেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নাম কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে ছাপা হবে এবং প্রতি সংখ্যায় তাঁর একটি করে লেখা ছাপা হবে কাগজে। এ ছাড়া জয়ন্তলালের বেশ সাহিত্যবোধ আছে দেখে গুরুপদবাবু তাঁকে রঘুনাথপুর দর্পণের কবিতা দেখার ভার দিয়েছেন। এত সব ক্ষমতা ও সুবিধে পেয়ে জয়ন্তলাল মাত্র দুশো টাকা মাইনেয় দু' বেলা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে। তবে তাঁর যাতায়াত বা মধ্যাহ্নভোজনের কোনও খরচা নেই। সে আসে কালিয়াপুরের পাশের একটা গ্রাম মঙ্গলহাটি থেকে নিজের সাইকেলে আর দুপুরে গুরুপদবাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়ে খায়। অনেক সময় রাতেও খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরে।

রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস আর ছাপাখানা অর্থাৎ রঘুনাথপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস একটি বড় টিনের চারচালা ঘরে। ঘরটা সদর রাস্তার উপরে এবং তার মধ্যে পার্টিশন করে ছাপাখানা আর কাগজের অফিস আলাদা করে রাখা আছে।

এই আটচালা ঘরের পিছনেই একটা ছোট তরকারির বাগান পার হয়ে গুরুপদবাবুর বাসা। বাসায় বলতে গেলে কেউ নেই। শুধু সবসময় একটি কাজের লোক আছে। সে-ই তরকারির বাগান দেখাশোনা করে, গুরুপদবাবুর কাপড়-চোপড় কাচে, ঘর ঝাড়ু দেয়, রান্নাবান্না করে। লোকটি রঘুনাথপুরের স্থানীয় বাসিন্দা, নামও রঘুনাথ, সন্ধ্যাবেলা সেও কাজ সেরে নিজের বাড়ি চলে যায়। রঘুনাথ ছেলেবেলায় গুরুপদবাবুর সঙ্গে এক পাঠশালায় দুই ক্লাস পড়েছিল। সেই সুবাদে সে গুরুপদবাবুকে তুই করে বলে। গুরুপদবাবুর মোটেই পছন্দ নয় ব্যাপারটা, কিন্তু আপত্তিও করতে পারেন না। রঘুকে ছাড়িয়ে দিয়ে এ-ব্যাপারে অন্য লোক সংগ্রহ করা অসম্ভব।

গুরুপদবাবুর তেষট্টি বছর বয়েস হয়েছে। তিনি হলে চিরকুমার, কখনও বিয়ে-থা করেননি। আর তাঁর জ্যাঠামশাই অভয়পদ দাস ছিলেন বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। কলকাতায় এবং কাছে-দূরে ভাই-ভাইপো আত্মীয়-কুটুম্ব বেশ কয়েকজন আছে, কিন্তু রঘুনাথপুরে এখন আর কেউ থাকে না। শুধু একা গুরুপদবাবু।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পর পর দুবারই অঙ্কে ফেল হয়েছিলেন গুরুপদবাবু। তখনকার দিনে কম্পার্টমেন্টাল বা ব্যাকের নিয়ম ছিল না। যে-কোনও একটা বিষয়ে ফেল করলে পুরো পরীক্ষাটা আবার দিতে হত। তৃতীয়বারে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তাঁর আর লেখাপড়ার জন্যে কোনও দম বা উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না।

গুরুপদবাবুর মামা ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডাকসাইটে বড়বাবু বা হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। লালবাজারের সদর দফতরে বসতেন। ম্যাট্রিক পাশ করা মাত্র ভাগনে গুরুপদকে তিনি বড়সাহেবকে ধরে কলকাতা পুলিশের সেপাইয়ের কাজ পাইয়ে দিলেন। যোগ্যতার সঙ্গে প্রায় ছত্রিশ বছর সেই চাকরি করে শেষ পর্যন্ত দারোগা হয়েছিলেন গুরুপদবাবু। তারপর অবসর নিয়ে বছর-পাঁচেক আগে নিজের গাঁয়ে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে চলে আসেন। তখনও তাঁর জ্যাঠাইমা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামশাইকে কাগজ চালাতে টুকটাক সাহায্য করতে করতে তিনি জড়িয়ে পড়লেন রঘুনাথপুর দর্পণের সঙ্গে। অবশেষে অভয়পদবাবুর মৃত্যুর পর এখন তো তিনি নিজেই সম্পাদক। অথচ কয়েক বছর আগেও যখন তিনি পুলিশের চাকরি করতেন একবার কি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পেরেছেন যে, তাঁকে একদিন কাগজ চালাতে হবে।

আর সে কোনও সাধারণ কাগজ নয়, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ঐতিহ্যবাহী, পল্লীজননীর নির্ভীক, নিরপেক্ষ, দামাল সংবাদ সাপ্তাহিক :

'সচিত্র রঘুনাথপুর দর্পণ'

যার প্রথম পৃষ্ঠার সবার ওপরে বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকে :

"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

অবশ্য কোনও কোনও সংখ্যায় এত বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি ব্যবহার না করে অভয়পদবাবুর স্বরচিত বাণীও ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলিও কম চমকপ্রদ নয়। কোনও কোনওটি রীতিমত শ্লেষাত্মক।

কয়েক বছর আগে এক পনেরোই অগস্টে রঘুনাথপুর দর্পণের স্বাধীনতা সংখ্যা বেরিয়েছিল। সেখানে প্রথম পৃষ্ঠায় কাগজের নামের

boiRboi.net

নীচেই প্রশ্নবোধক বাণী ছাপা হয়েছিল।

স্বাধীনতা ? স্বাধীনতা ?? স্বাধীনতা ???
সে কি শুধু তা ধিনতা ! তা ধিনতা !!

বলা বাহুল্য যে, রঘনাথপুর দর্পণের এই স্বাধীনতা সংখ্যাটি আগাগোড়া ধিক্কারধ্বনি এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়বোধক চিহ্নে (!) পূর্ণ ছিল। কোনও ছাপাখানাতেই বিস্ময়বোধক চিহ্ন অর্থাৎ দাঁড়ির নীচে শূন্য বানানো চিহ্নটি খুব বেশি থাকে না। ফলে সেই সংখ্যার জন্যে রঘুনাথপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কসে এই চমকসূচক চিহ্নটির বাবদ প্রায় পঁচিশ টাকার নতুন হরফ কিনতে হয়েছিল।

তবে এর পর থেকে সুবিধে হয়ে গেছে, যতই শ্লেষ, বিদ্রূপ বা ধিক্কার রঘুনাথপুর দর্পণে মুদ্রিত হোক তার জন্যে উপযুক্ত চিহ্নের অভাব পড়ে না।

অবশ্য এইটুকু পড়ে যদি কারও মনে এমন ধারণা জন্মায় যে, সচিত্র রঘুনাথপুর দর্পণ নিতান্তই একটি শ্লেষাত্মক বা ধিক্কারসর্বস্ব গতানুগতিক গ্রাম্য পত্রিকা, তবে সে ধারণা সর্বৈব ভুল।

কখনও-কখনও ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ ছাপা হলেও রঘুনাথপুর দর্পণে স্থানীয় সংবাদ, দেশের সংবাদ এবং বিশ্ব-সংবাদ ছাড়াও অনেক রকমের চমকপ্রদ এবং হৃদয়গ্রাহী রচনা ছাপা হয়।

এই তো গত সংখ্যাতেই বিখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র-শিকারি শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমৎকার উপদেশমূলক নিবন্ধ 'বাঘের বাচ্চা বাঁচাইয়া রাখার পদ্ধতি' ছাপা হয়েছে।

প্রবন্ধটির বক্তব্য হল যে, কেউ যদি কোনও জঙ্গলের মধ্যে বাঘের বাচ্চা কুড়িয়ে পায়, (যেন জঙ্গলের ভিতরে হাঁটতে গেলে হামেশাই বাঘের বাচ্চা কুড়িয়ে পাওয়া যায়) তা হলে সেই বাচ্চাকে কী করে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঘের বাচ্চা বাঘের দুধ ছাড়া খেতে চায় না, কিন্তু বাঘের দুধ সংগ্রহ করা যে চাট্টিখানি কথা নয় এ-কথা সকলেই জানে।

জয়চন্দ্রবাবু তাঁর সুগম্ভীর আলোচনায় আশার বাণী শুনিয়েছেন, লিখেছেন যে, 'একটু চেষ্টা করলেই বাঘের বাচ্চাকে বোতলে করে গোরুর

pathagar.net

দুধ খাওয়ানো যাবে। আর তা ছাড়া যদি ওই বাচ্চা খুব বড় না হয় তা হলে ধারে-কাছে কোনও মা-কুক্কুরী থাকলে সেই কুক্কুরীর ছানাদেব সঙ্গে এই বাচ্চাকেও দুধ খাওয়ানো যাবে।

তবে সাবধান, বাঘের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চাদের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি বড় হবে, একটু বড় হয়ে গেলেই কুকুর ছানাদের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে, না হলে সে তাদের ঘাড় মটকিয়ে মেরে ফেলবে, এমনকী, মা-কুকুরকেও মেরে ফেলতে পারে।

সুতরাং বাঘের বাচ্চার উন্নতি এক ফুট হওয়ামাত্র তাকে আলাদা করে ফেলতে হবে এবং তখন থেকে তাকে নিয়মিত মাংস খেতে দিতে হবে।'

এইরকম একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে রঘুনাথপুর দর্পণের বৈশিষ্ট্য বোঝানো যাবে না। একটু বিস্তারিত করে লেখাই বোধ হয় ভাল।

গত তিরিশ বছরে রঘুনাথপুর দর্পণে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম, 'কলকাতা কোন্ পথে ?' 'বিশ্বাসের হাটের বিশ্বাসযোগ্যতা', 'পাটগাছের পোকা কখন জন্মায়', 'কালো গোরুব ঘন দুধ'।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির প্রথমটির কথাই ধরা যাক। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন স্বর্গত প্রাক্তন সম্পাদক অভয়পদবাবু স্বয়ং। প্রবন্ধটির নাম পড়ে হঠাৎ মনে হতে পারে এটি কলকাতার অবক্ষয়ের বা দুর্ব্যবহার বিষয়ে একটি আলোচনা।

কিন্তু এ-প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর আগে, রঘুনাথপুর দর্পণের সেই আদি যুগে। কলকাতার অবস্থা তখনও এত খারাপ হয়নি আর কলকাতা কোন্ পথে প্রবন্ধটি মোটেই কলকাতার বিষয়ে নয়।

রঘুনাথপুর থেকে কলকাতায় কালিয়াপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে যাওয়া ছাড়াও আরও অন্য পথ আছে, সেই পথগুলির কথাই এই আলোচনায় বলা হয়েছে। রেলপথের চেয়ে পুরনো স্থলপথ অনেক শর্টকাট, প্রায় দশ কিলোমিটার কম পড়ে। কিছুটা সাইকেল-রিকশ, তারপরে খেয়া, তারপরে আবার রিকশ, তারপরে বাস, দু'বার বাস বদল, এভাবে কলকাতা যাওয়া যায়। অনেক আগে লোকেরা প্রথম কিছুটা পথ

পায়ে হেঁটে তারপরে ঘোড়ার গাড়িতে এ-পথেই কলকাতা যেত।

তা ছাড়া রয়েছে জলপথ। নৌকো ঠিকমতো চললে, জোয়ারের সময় একটু সাবধানে যেতে পারলে দেড় থেকে দু' দিনের মাথায় বেশ আরামে কালীঘাটের আদিগঙ্গায় চেষ্টা করলে পৌঁছানো যায়।

রঘুনাথপুর থেকে কলকাতা পৌঁছনোর এইরকম সব পথের হদিস দিয়েছিলেন অভয়পদবাবু তাঁর সেই সারগর্ভ আলোচনায়।

পরের প্রবন্ধটি অবশ্য অভয়পদবাবুর রচনা নয়। বিষয়টি খুবই বিতর্কিত এবং বিস্ফোরক। সেইজন্যই এই প্রবন্ধে লেখকের যে নাম ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটা নিতান্তই ছদ্মনাম।

অনেকে ধরে নিয়েছিল ওই প্রবন্ধ সম্পাদক অভয়পদবাবুর নিজেরই লেখা, কিন্তু সেটা ঠিক নয়।

রঘুনাথপুরের মাইল তিন-চারেক দূরেই এ-অঞ্চলের সবচেয়ে জমজমাট সাপ্তাহিক বাজার বিশ্বাসের হাট। প্রতি শনিবার বিকেলে এই হাট বসে। আশপাশের কাছে-দূরের নানা গ্রামগঞ্জ থেকে চাষিরা তরকারি, ফল, ধান, চাল এইসব এই হাটে বিক্রির জন্যে নিয়ে আসে। কলকাতা থেকে ব্যাপারিরা দলে দলে এসে এখান থেকে তরিতরকারি ইত্যাদি কিনে নিয়ে যায়। তারা কলকাতা থেকে তাদের নিজেদের দাঁড়িপাল্লা, ওজনের বাটখারা নিয়ে আসে। তাদের কাছে চাষিরা বিশেষ সুবিধে করতে পারে না, না ওজনে, না দামদরে। তা ছাড়া অনেক ব্যাপারির চাষিদের আগাম দাদন দেওয়া আছে, তাদের ফসল উঠবার আগে সেগুলো তারা রীতিমত কম দামে কিনে নিয়েছে টাকা আগাম দিয়ে।

কিন্তু এই চাষিরাই সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্র তাদের নিজেদের ও আশপাশের গ্রামের চেনা লোকদের যথাসাধ্য ঠকায়। এ-ব্যাপারে তাদের চক্ষুলজ্জা বলতে কিছু নেই। হয়তো অনেক দামদর করে এক কেজি বা দু' কেজি বেগুন কেনা হল, বাড়ি এসে দেখা গেল যে, ওজনে কয়েকশো গ্রাম কম দিয়েছে আর বাকি বেগুনের অর্ধেকের বেশি কানা, পোকায় খাওয়া বা পাকা বেগুন। এ-ব্যাপারে তাদের হাতের কারসাজি দেখার মতো, যে-কোনও ঘুঘু ম্যাজিশিয়ান এদের কাছে নতুন করে হাতসাফাই

শিখতে পারে।

শুধু চাষিদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? আশপাশের গ্রামের জেলেরাও হাটবারে বিশ্বাসের হাটে মাছ বেচতে আসে। অন্যের কথা কি, গুরুপদবাবুকেও তারা বহুবার ঠকিয়েছে। বছর কয়েক আগের একটা ব্যাপার, অভয়পদবাবুর গুরুতর অসুখ, কবিরাজ তাঁকে টাটকা মাগুর মাছ খেতে বলেছেন। হাট থেকে এক কুড়ি মাগুর মাছ কিনে নিয়ে গেলেন গুরুপদবাবু তাঁর জ্যাঠামশায়ের জন্য, বাড়ি ফিরে দেখেন তার মধ্যে সাতটাই শোলমাছের বাচ্চা, এমনকী, একটা ল্যাঠা মাছ পর্যন্ত আছে।

'বিশ্বাসের হাটের বিশ্বাসযোগ্যতা' প্রবন্ধটি এ-অঞ্চলে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল। এতদিন পরে এখন আর বলতে বাধা নেই প্রবন্ধটি অভয়পদবাবু না লিখলেও লিখেছিলেন গুরুপদবাবু। তখন তিনি দারোগার চাকরি থেকে সদ্য রিটায়ার করে এসেছেন, আইনি-বেআইনি সম্পর্কে তখনও তাঁর যথেষ্ট চিন্তাভাবনা।

এই প্রবন্ধের ফলে বিশ্বাসের হাটের ব্যবসায়ীরা যে এক ইঞ্চিও সততার পথে পা বাড়িয়েছিল তা কিন্তু বলা যাবে না। তারা যা করছিল ঠিক তাই করতে লাগল। তবে অঞ্চলের সাধারণ ক্রেতারা এই আলোচনা পাঠ করে যৎকিঞ্চিৎ সাবধান হয়ে গিয়েছিল, তাতে যদি তাদের কিছু উপকার হয়ে থাকে তা হলেও প্রবন্ধটি বিফলে যায়নি।

অন্যান্য প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আর বিশেষ-কিছু বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। সকলেই বুঝতে পারছেন, সচিত্র রঘুনাথপুর সংবাদ সাপ্তাহিকে কী জাতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আগে প্রবন্ধটাই ছিল রঘুনাথপুর দর্পণের প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু বছরখানেক আগে মঙ্গলহাটি গ্রামের শ্রীযুক্ত জয়ন্তলাল কর্মকারকে কবিতার পৃষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে এই কাগজের আসল বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে কবিতায়।

কতরকমের যে কবিতা আছে পৃথিবীতে। ছোট বড় মাঝারি, মিল দেওয়া, মিল না-দেওয়া, কোনওটায় ছন্দ মেলানো, কোনওটায় ছন্দ না-মেলানো। জয়ন্তলাল সমস্ত রকমের কবিতাই খুব ভালবেসে যত্ন করে দেখেন এবং সম্ভব হলে ছাপান।

pathagar.net

জয়ন্তলাল মনে করেন কবিতা লেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল.

pathagar.net

কবিতার খুব রমরমা চলছে আজকাল। ঘরে ঘরে, বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় পাড়ায় কবি। এমনও সব বাড়ি আছে যেখানে ছেলে কবি, বাবা কবি, ঠাকুর্দা কবি। কাকা-জ্যাঠারাও তাই, এমনকী, মা, ঠাকুমা, দিদি, বউদির মধ্যে পর্যন্ত কবি আছে। কবিতে কবিতে ছয়লাপ হয়ে গেছে দেশ।

অবস্থা বেগতিক দেখে সমাজবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করছেন, এত কবি কেন। সমালোচকেরা প্রশ্ন করছেন এত কবিতা কেন?

জয়ন্তলাল

জয়ন্তলাল কর্মকার সাহিত্যরসিক। তিনি রঘুনাথপুর দর্পণে চাকরি করেন এবং পদ্যের পাতাটা দেখেন কিন্তু তিনি নিজে কবি নন, নিতান্ত একজন কবিতাপাগল যুবক। তিনি মনে করেন, কবিতা লেখা স্বাস্থ্যের এবং মনের পক্ষে ভাল। সমাজের পক্ষে ভাল, দেশের পক্ষে ভাল, জাতির পক্ষে ভাল।

জয়ন্তলালের কথা হল কবিতার মতো নির্দোষ আমোদ আর কিছু নেই। কবিতা লিখে কোনওদিন কারও কোনওরকম ক্ষতি করা যায় না। কবিতা লেখায় কোনও বাজে খরচা নেই, সামান্য একটু কাগজ আর পেন্সিল। একজন যদি মাসে একশো কবিতা লেখে, অর্থাৎ দৈনিক তিন-চারটে করে, তা হলে গড়ে তার দৈনিক খরচ হবে বড়জোর দশ বা পনেরো পয়সা। এর তিনগুণ পয়সা লাগে একটা জরদা-পান খেতে।

হয়তো এসবের জন্যেই ক্রমশ কবির সংখ্যা এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন সারা দেশে যত লোক ফুটবল খেলে, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক কবিতা লেখে। আবার এর মধ্যে এমন অনেক কবি আছে যে, যখন কবিতা লেখে না তখন ফুটবল খেলে, এমনকী, এমন ফুটবল-খেলোয়াড়ও আছে যে, সুযোগ পেলেই কবিতা লেখে।

চিরকাল কিন্তু কবি হওয়ার এমন সুযোগ ছিল না। এই রঘুনাথপুর দর্পণের পৃষ্ঠায় জয়ন্তলাল নিজেই একবার একটি হৃদয়গ্রাহী নিবন্ধ

boiRboi.blogspot.in

লিখেছিলেন। বহু চিন্তা, বিশ্লেষণ ও গবেষণার ফসল সেই নিবন্ধটি। নিবন্ধটির নাম ছিল, 'একদিন কবিতা লেখা এত সহজ ছিল না'। নামটি দীর্ঘ হলেও মৌলিক চিন্তার খোরাক ছিল সেখানে।

জয়ন্তলাল লিখেছিলেন যে, আগেকার দিনে, এই সামান্য দেড়শো-দুশো বছর আগেও যখন লিখবার কাগজ সহজলভ্য ছিল না, দোকানে-দোকানে কিনতে পাওয়া যেত না, তখন কবিতা লিখতে হত তালপাতায়। তালপাতা বাজারে বিক্রি হত না। হয়তো পাখির পালক ছুঁচলো করে কিংবা খাগের কঞ্চি কেটে কলম বানানো যেত, কাঠকয়লার গুঁড়ো বা মেটেসিঁদুর জলে গুলে কালিও বানানো যেত কিন্তু তাতে কালি হল, কলম হল, কাগজ হল না।

ভরসা ওই তালপাতা। কিন্তু আমার নিজের বাড়িতে তালগাছ না থাকলে অন্যের বাড়ি থেকে আমাকে তালপাতা দেবে কেন? সুতরাং আমাকে কবিতা লিখতে গেলে আমার নিজের তালগাছ চাই। কিন্তু দু-দশ বছরে তালগাছ মোটেই বড় হয় না। আমি এ-বছর তালগাছ লাগিয়ে সামনের বছর থেকে কবিতা লিখব সে উপায় নেই। তালগাছে তেমন পাতা হতে বিশ-পঁচিশ বছর কেটে যাবে।

তাই জয়ন্তলালের বক্তব্য যদি পূর্বপুরুষ বাবা-ঠাকুর্দা এঁরা বাড়িতে কোনওদিন একজন কবি জন্মালেও জন্মাতে পারে এই আশায় তালগাছ লাগিয়ে রাখেন তবেই ভরসা, না হলে এক পুরুষে কবি হওয়া অসম্ভব। ইচ্ছে করলেই দু' পাতা কাগজ বিশ পয়সায় কিনে আজকালকার মতো সরসর করে দশখানা পদ্য লেখা সে-যুগে সম্ভব ছিল না। পিতা-পিতামহ রোপিত তালগাছ বাড়িতে থাকলেই সেই তালগাছের পাতা কেটে কাব্যরচনা সম্ভবপর হত।

বাজারে তালপাতার পাখা হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু আনকোরা তালপাতা সহজলভ্য ছিল না। কারণ ঘরে ঘরে এত কবি ছিল না। একটা বাজারের এলাকার মধ্যে দশ-বারোটা গ্রাম খুঁজে একজন কবি হয়তো পাওয়া যেত। কিন্তু সেই একজনের জন্য কে খুলবে তালপাতার দোকান?

pathagar.net

...সেই যেখানে ক্ষুদ্র চঞ্চু
বৃহৎ চঞ্চুর সঙ্গে লড়ে,
হঠাৎ ঘুরে পিছন থেকে
কোঁতকা মেরে সরে পড়ে।
কোঁতকা কথার মানেটা কি ?
কোঁতকা দিলে লাগে নাকি ?
বৃহৎ চঞ্চু হেসে বলে,
'কোঁতকা মানে সবই ফাঁকি।'
...'হঠাৎ ভাবলে মনে হবে,
কোঁতকা খেলে সর্বনাশ'.....

রঘুনাথপুর দর্পণের কবিতা দেখছিলেন জয়ন্তলাল কর্মকার।

আজ সাড়ে তিন দিন হল রঘুনাথপুর এবং আশপাশের এলাকায় লাগাতার লোডশেডিং চলছে। এদিকটার এরকম মাঝে-মাঝেই হয়।

তা ছাড়া যদি কখনও লাইনে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, ভোলটেজ খুব কম, একশো পাওয়ারের বাল্‌বগুলো টিমটিম করে জ্বলে। পাখা ফুল স্পিডে চালালেও সামান্য হাওয়া পাওয়া যায় না।

পাখার হাওয়ার অভ্যেস নেই রঘুনাথপুর দর্পণের প্রধান ও একমাত্র সহায়ক জয়ন্তলাল কর্মকারের। বিদ্যুতের আলোর আশাও তিনি করেন না। রঘুনাথপুরের অন্যান্য বাড়িতে, যেমন, রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস ঘরেও হ্যারিকেন-লন্ঠনের ব্যবস্থা।

ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। মেঘে-মেঘে সারা আকাশ ঢাকা। সূর্যাস্তের আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ির পিছনের দিকে একটা আদ্যিকালের ডোবা আছে, সেই ডোবার পাড়ে বাঁশঝাড়। বেশ ঘন বাঁশের ঝোপ আর তার ফাঁকে-ফাঁকে কালকাসুন্দির জঙ্গল। ওই ঝোপ আর জঙ্গলের মধ্যে এখনও কয়েকটা শেয়াল আছে। একটু আগেই সেগুলো প্রাণ খুলে হুক্কাহুয়া চেঁচিয়েছে। শেয়ালের ডাকের পরেই সব সময়ে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

টেবিলের উপরে মাথা গুঁজে হ্যারিকেন-লন্ঠনের আলোয় কবিতার ফাইলটা দেখছিলেন জয়ন্তলাল। সামনের সংখ্যা রঘুনাথপুর দর্পণের

pathagar.net

জন্যে কবিতা বাছাই করতে হবে।

দু-তিনটে অতি বাজে কবিতা ফেলে দেওয়ার পরে হাতে এসেছিল 'সেই যেখানে ক্ষুদ্র চঞ্চু বৃহৎ চঞ্চুর সঙ্গে লড়ে' কবিতাটি। কবিতাটি লিখেছেন পাশের কালিয়াপুরের প্রবীণ পোস্টমাস্টার রণধীর দত্তচৌধুরী মহাশয়।

রণধীরবাবুর কবিতা লেখার হাত ভাল, কিন্তু শব্দ ব্যবহারের ত্রুটি আছে। তিনি লিখেছিলেন,

'ওই যেখানে ক্ষুদ্র শশক
বৃহৎ বাঘের সঙ্গে লড়ে'...

অনেক ঘষে মেজে কসরত করে 'ক্ষুদ্র শশক' এবং 'বৃহৎ বাঘ'কে জয়ন্তলাল ক্ষুদ্র চঞ্চু এবং বৃহৎ চঞ্চুতে রূপান্তরিত করেছেন এবং পদ্যের মধ্যে 'কোঁতকা' শব্দটিকে ঢুকিয়ে পদ্যটির প্রায় খোল-নলচে বদলিয়ে ফেলেছেন। শুধু আটকে গেছেন একাদশ-দ্বাদশ পঙ্‌ক্তিতে এসে 'সর্বনাশ' মিল দিতে গিয়ে। 'চ্যবনপ্রাশ' চমৎকার হবে, এতে কবিতায় একটা নতুন ব্যঞ্জনাও আসবে, কিন্তু পঙ্‌ক্তি দুটো মাথার মধ্যে খেলছে, কলমে আসছে না, এই অবস্থায় শেয়ালের ডাকে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল।

শেয়াল ডাকল এবং থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে ঘোর নিস্তব্ধতা।

আকাশে খুব মেঘ করেছে। তাই সন্ধ্যা হতে-না-হতে রাস্তাঘাট লোকজন শূন্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য পৌনে সাতটা নাগাদ কালিয়াপুর স্টেশনে কলকাতার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা এলে এদিককার কিছু-কিছু লোক শহর থেকে কাজ করে ফিরবে সে ট্রেনে। দু-চারটে সাইকেল, সাইকেল-রিকশ, কয়েকজন পথচারী রাস্তায় দেখা যাবে।

মেঘের গতিক ভাল নয় দেখে জয়ন্তলাল ঠিক করলেন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়বেন। তাঁর সাইকেল আছে, এখান থেকে বাড়ি মঙ্গলহাটি যেতে সাইকেলে পনেরো-বিশ মিনিট প্রায় লাগে। কিন্তু রাত্রিবেলা তিনি গুরুপদবাবুর বাসায় সাধারণত খেয়ে বাড়ি ফেরেন। আজও খেয়ে ফিরতে গেলে হয়তো দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হবে।

pathagar.net

জয়ন্তলাল ঠিক করলেন, আজ রাতে এখানে খাওয়ার দরকার নেই। তাঁর বাসায় বুড়ি-পিসিমা আছেন, তাঁকে গিয়ে বলতে হবে, চাট্টি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিতে। পিসি তাতে খুশিই হবেন।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র চঞ্চু বৃহৎ চঞ্চুর পদ্যটার মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন।

তা ছাড়া ওই একই সঙ্গে পোস্টমাস্টার দত্তচৌধুরীমশাই আরও একটা কবিতা পাঠিয়েছেন, সেই কবিতাটিও একটু পরিমার্জনা করা দরকার। সম্ভব হলে রণধীর দত্তচৌধুরীর দুটো কবিতাই সামনের সংখ্যা রঘুনাথপুর দর্পণে ছাপানো হবে। তা হলে আপাতত বাজে কবিতা ঘেঁটে বাছার কাজ থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

পোস্টমাস্টারমশাইয়ের কবিতায় এক-একসময় ডাকঘরের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। গালা, মোম, গঁদের আঠা, নতুন ডাকটিকিটের করকরে সৌরভ, কীভাবে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চলে আসে রণধীরবাবুর পদ্যে।

এই দ্বিতীয় কবিতাতেই গঁদের আঠা, এনভেলাপের প্রসঙ্গ রয়েছে। পুরো কবিতায় মেজাজের সঙ্গে ব্যাপারটা খুব খাপ খায়নি, কিন্তু কবিতাটির মধ্যে একটু রহস্যের আভাস আছে আর এই রহস্যের ব্যাপারটা জয়ন্তলালবাবুর খুবই পছন্দ।

আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘও খুব ডাকছে। এখনই, আর একটুও দেরি না করে সাইকেলে চেপে মঙ্গলাহাটির দিকে রওনা হওয়া উচিত। গুমোট যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে মনে হচ্ছে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি মুষলধারে শুরু হবে।

উঠলে এখনই ওঠা উচিত। আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়।

লণ্ঠনের সামনে দরদর করে ঘামতে-ঘামতে পোস্টমাস্টারমশাইয়ের কবিতা দুটো হাতে ধরে জয়ন্তলাল নিবিষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। উঠতে গিয়েও উঠছেন না। কবিতার ব্যাপারে তাঁর ভয়ঙ্কর নেশা। তেমন তুমুল বৃষ্টি হলে যে আজ রাতে আর বাড়ি ফিরতে হবে না, এই ঘন বর্ষায় রাতে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসঘরে মশার কামড় খেয়ে টেবিলের উপরে বই মাথায় দিয়ে শুয়ে রাত কাটাতে হবে, তা তিনি জানেন। তবু অন্ততপক্ষে রণধীর দত্তচৌধুরীমশাইয়ের কবিতা দুটোর একটা ফয়সালা না

করে জয়ন্তলালের বাড়ি ফিরতে মন উঠল না।

তিনি প্রথম কবিতাটির শেষ অংশটুকু নিয়ে আরও কয়েকবার চেষ্টা করলেন, অনেক মাথা ঘামালেন কিন্তু সর্বনাশ-এর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ মিল যত চমৎকারই হোক না কেন, কিছুতেই পঙ্‌ক্তিটা সাজাতে পারলেন না।

'হঠাৎ ভাবলে মনে হবে
কোঁতকা খেলে সর্বনাশ...'

এর পর অনেক দ্বিধা করে অনেক চিন্তা করে বসালেন,

'যোগব্যায়ামের মুষ্টিযোগ
আয়ুর্বেদের চ্যবনপ্রাশ।'

কিন্তু কিছু পরে এই পঙ্‌ক্তি দুটো তেমন জুতসই মনে হল না জয়ন্তলালের, কেমন যেন খাপছাড়া। একটু পরে নিজের ওপরে নিজেই বিরক্ত হয়ে ঘচাং করে লাইন দুটো কেটে ফেললেন।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। চারদিকের পৃথিবীটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। রঘুনাথপুর দর্পণের বাড়ির মধ্যে উঠোনে কালাচাঁদ নামে একটা কালো কুচকুচে কুকুর থাকে। বৃষ্টিতে ভিজে কুঁকড়ে গিয়ে সেটা ভয়ে-ভয়ে অফিসঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এ-ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ। সে সেটা ভাল করেই জানে। তাই এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে তখনও ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে।

অন্য সময় হলে কালাচাঁদকে এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতেন জয়ন্তলাল, কিন্তু এখন কিছু বললেন না। এখন কবিতার মেজাজ তাঁর। কবিতায় ডুবে আছেন তিনি।

বরং উঠে গিয়ে সামনের পুব দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বর্ষার হাওয়া, ওই দিক থেকেই জোর ঝাপটে ছুটে আসছে হুহু করে। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া কুকুরটাই শুধু ঠাণ্ডায় কাঁপছে, তা নয়। তাঁরও একটু শীত-শীত করছে, একটু হিম-হিম ভাব। তা ছাড়া হাওয়ার দাপটে হ্যারিকেন-লণ্ঠনের শিখাটাও মাঝে-মাঝে দপদপ করে উঠছে, হঠাৎ নিভেও যেতেও পারে।

pathagar.net

দরজা বন্ধ করে টেবিলে ফিরে এসে লণ্ঠনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে আবার পোস্টমাস্টার দত্তচৌধুরীমশাইয়ের পদ্য দুটোয় মনোনিবেশ করলেন জয়ন্তলাল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন, প্রথম পদ্যটা এখন হবে না। আপাতত এটা মুলতুবি রেখে পরের পদ্যটায় হাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এক-একটা পদ্য যখন এক-একবার ঠেকে যায় কিছুতেই হতে চায় না। অভিজ্ঞতা থেকে, বহু কবিতা পরিমার্জনা করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জয়ন্তলাল জানেন এ-সময়ে কবিতাটা ছেড়ে দিয়ে পরে আবার চেষ্টা করাই ভাল।

ফলে, এবার সেই গঁদের আঠা, এনভেলাপের প্রসঙ্গ জড়িত দ্বিতীয় কবিতাটি যাচাই করতে শুরু করলেন।

বাইরে বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। মনে হচ্ছে ঝড়ও উঠেছে। কালাচাঁদ কুকুরটার সাহস একটু বেড়ে গেছে। সে ঘরের মাঝামাঝি এগিয়ে এসে টেবিলের পায়া ঘেঁষে জয়ন্তলালের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। খুব কাছে কোথায় একটা বাজ পড়ল। কালাচাঁদ চমকে লাফিয়ে উঠে একটু ঘেউ ঘেউ করল ওপরের দিকে মুখ তুলে, কোনও অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন জয়ন্তলাল। বাজের শব্দে যে-কোনও মানুষ, জীবজন্তুই চমকায়, হয়তো-বা গাছপালাও চমকায়। জয়ন্তলালও চমকিয়ে ছিলেন। একটু পরে তাঁর সংবিৎ ফিরে এল।

পোস্টমাস্টার দত্তচৌধুরীমশাইয়ের দ্বিতীয় কবিতাটি বেশ ভাল, চমৎকারই বলা চলে। অন্তত প্রথম দু' পঙ্‌ক্তি বাদ দিলে পরিমার্জনার কোনও প্রয়োজন আছে বলে জয়ন্তলাল মনে করেন না।

পুরো কবিতাটি অতি দীর্ঘ, নাম গুরুগম্ভীর অনেকটা মহাকাব্যপন্থী। কবিতার নাম 'মহাশ্মশান'।

জয়ন্তলাল একবার ভাবলেন, রণধীরবাবুর মানে শ্রীযুক্ত রণধীর দত্তচৌধুরীর নামটা মহাকাব্যজনোচিত। তিনি কল্পচক্ষে দেখতে পেলেন, রবিবারের খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন—

pathagar.net

মহাকবি রণধীর দত্তচৌধুরী
বিরচিত
এ-যুগের মহাকাব্য
মহাশ্মশান

তবে এই মহাশ্মশান পদ্যটি মাত্র আঠারো অনুচ্ছেদ, প্রতি অনুচ্ছেদে চার পঙ্‌ক্তি, অর্থাৎ সবসুদ্ধু বাহাত্তর পঙ্‌ক্তির পদ্য। অবশ্যই রঘুনাথপুর দর্পণের পক্ষে বড়, খুবই বড়। কিন্তু মহাকাব্য হিসেবে মাত্র বাহাত্তর পঙ্‌ক্তি, মহাসমুদ্রে তুচ্ছ জলবিন্দুর মতো।

(বিষয়টি বেশি জটিল না করে, কাব্য তথা মহাকাব্য বিষয়ে কোনও জটিল প্রসঙ্গে না গিয়ে জয়ন্তলালবাবুর সুবিধের জন্য আপাতত পোস্টমাস্টার কবিবরের মহাশ্মশান কবিতার প্রথম আট পঙ্‌ক্তি দেখা যাক।)

অপরিসীম এনভেলাপে
ঠোঁটের মধ্যে গঁদের আঠা।
অমাবস্যার মধ্যরাতে
কাদের পুজো কাদের পাঁঠা ॥
হাঁড়িকাঠে মুণ্ডু গড়ায়
গা ছমছম ঢাকের বোল।
শ্মশান ঘাটে কবি চেঁচায়,
'বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল।'

কবিতাটি জয়ন্তলালবাবুর এখন মোটামুটি ভাল লাগছে। কিন্তু কবিতার মধ্যেও রণধীরবাবুর ওই পোস্টমাস্টারি ব্যাপারটা, ওই অহেতুক এনভেলাপ আর গঁদের আঠা এসব তাঁর মোটেই পছন্দ নয়।

অনেক ভাবলেন তিনি, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওই কবিতাটি বার বার পড়লেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে কোনও সায় পেলেন না শব্দ দুটো ব্যবহারের। সত্যি শব্দ দুটো এভাবে এখানে ব্যবহার করায় কবিতার মানেটাও খুব জটিল হয়ে গেছে।

অনেক কাটাকুটি করে, অনেক বুদ্ধি খরচ করে জয়ন্তলাল প্রথম

pathagar.net

পঙ্‌ক্তির এনভেলাপকে কালো খাম করলেন, তারপর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'গঁদের আঠা'কে কেটে বানালেন 'আঁধার আঠা' এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি অবশেষে দাঁড়াল :

'অপরিসীম কালো খামে
ঠোঁটের মধ্যে আঁধার আঠা।'

এতক্ষণে কবিতাটির মধ্যে তবু একটা মানে-মানে ভাব এল, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন জয়ন্তলালবাবু।

রণধীরবাবুকে নিয়ে এই অসুবিধেটা সর্বদাই অনুভব করেন জয়ন্তলাল, তাঁর ডাকঘরকে তিনি জোর করে কবিতার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

কিছুদিন আগে যখন ডাকবিভাগের বাজেটে খাম, ইনল্যান্ড আর টিকিটের দাম বেড়ে গেল পোস্টমাস্টারমশাই রণধীরবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি পুরনো তিন পয়সা পোস্টকার্ড আর ছয় পয়সা এনভেলাপের যুগে জন্মেছিলেন। শুধু তাই নয়, তখন বড়-বড় শহরে দু' পয়সা দামে লোকাল পোস্টকার্ড ছিল। আর এখন পোস্টকার্ডের দাম বেড়েছে তিন গুণ, আর খামের দাম বেড়েছে পাঁচগুণ।

ডাক-বাজেট রাত সাড়ে সাতটায় দিল্লির আকাশবাণীর সংবাদে শোনার পর সঙ্গে-সঙ্গে রণধীরবাবু লিখে ফেলেছিলেন একটি মর্মান্তিক কবিতা, করুণ বেদনাবহ সেই প্রশ্নবোধক কবিতা জয়ন্তলালকেও স্পর্শ করেছিল। সেই কবিতা পাওয়ামাত্র জয়ন্তলাল রঘুনাথপুর দর্পণে ছাপতেও দিয়েছিলেন কিন্তু সম্পাদক গুরুপদবাবু ছাপেননি।

কবিতাটির নাম ছিল, 'খামের বাড়ে দাম', খুবই ছোট সেই কবিতা :

খামের জন্যে চিঠি নাকি ?
চিঠির জন্যে খাম ?
পত্রদাতা কেঁদে বলেন,
'হলেন বিধি বাম।'
চিঠি লেখা শিকেয় ওঠে,
খামের বাড়ে দাম॥

pathagar.net

গুরুপদবাবু বলেছিলেন, "পোস্টমাস্টারমশাইয়ের কোনও শোধবোধ নেই। এই চিঠি ছাপা হলে তা মাস্টারমশাইয়ের চাকরি চলে যাবে। তখন খাবেন কী ? আর না খেয়ে কবিতাই বা লিখবেন কী করে ?"

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ঝড়-বৃষ্টি সব থেমে গেল। চারদিকে সুনসান। কোথাকার মেঘ কোথায় চলে গেছে। আকাশ ঝকঝকে নীল। দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীর, শুক্লপক্ষের একটা তিনপোয়া-সাড়ে তিনপোয়া সাইজের চাঁদ আকাশ জাঁকিয়ে উঠে এল।

গুরুপদবাবুর সঙ্গে আসনপিঁড়ি হয়ে মেজেতে বসে রঘুনাথের রান্না একথালা রাঙা চালের ভাত, মটরের ডাল, সরপুঁটি মাছ ভাজার সঙ্গে শালুকডাঁটার অম্বল দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভরপেট খেয়ে নিয়ে রঘুনাথের কাছ থেকে একটু জোয়ান চেয়ে নিয়ে মুখে ঢেলে মঙ্গলাহাটির দিকে যাওয়ার জন্য সাইকেলে উঠলেন জয়ন্তলাল।

জ্যোৎস্নায় দশদিক ঝলমল করছে। সদ্য শেষ হওয়া বৃষ্টির জলের স্রোতের উপরে চাঁদের আলোর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমে গলা ফাটিয়ে ডাকছে।

ভরপুর জ্যোৎস্নায় পূর্ণ কদমে সাইকেলের প্যাডেল চালাতে চালাতে জয়ন্তলাল ভাবতে লাগলেন, আমি নিজেও কি পারি না একটা কবিতা লিখতে ?

পশ্চাৎপট

শ্রীযুক্ত অভয়পদ দাস নামজাদা হেডমাস্টার ছিলেন। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে নিয়ামত আলি মালটিপারপাস হাই স্কুলের খ্যাতি এখনও আছে। সে খ্যাতির কারণে অনেকটাই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামত আলি সাহেব এবং কিছুটা প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক অভয়পদ দাস।

বলতে গেলে নিয়ামত আলির সহযোগিতায় অভয়পদবাবু কঠোর পরিশ্রম করে স্কুলটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন।

pathagar.net

সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

সাধারণত আগের ব্যাপার আগে। পরের ব্যাপার পরে। এই-ই নিয়ম।

কিন্তু গল্প-উপন্যাস লেখার সময় সদাসর্বদা এ-নিয়ম মেনে চলা যায় না।

জয়ন্তলাল কর্মকারের কথাটা আগেভাগেই বলে না নিলে রঘুনাথপুর দর্পণের এই সত্য ঘটনা অবলম্বনে আখ্যানটি মোটেই জমবে না মনে হওয়ায় আগেই ও-ব্যাপারটা সেরে নিলাম।

অতঃপর সূত্র ধরে গোড়ার দিকে ফিরে যাচ্ছি, ছোট করে রঘুনাথপুর দর্পণের আরম্ভের ইতিহাসটা বলি। জয়ন্তলালের কথা একটু পরেই আবার আসবে।

নিয়ামত আলি নিজেই তাঁর হাই স্কুলে অভয়পদবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিয়ামত আলি ছিলেন রঘুনাথপুর অঞ্চলেরই লোক। ব্যবসাসূত্রে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে গিয়ে প্রচুর টাকাকড়ি ও ধান জমি করেন। তিনি ভাল লেখাপড়া জানতেন না, কোনওরকমে নামসই করতে পারতেন।

পাশের পাড়ার লোক বলে নিয়ামত আলি ছেলেবেলা থেকেই অভয়পদবাবুকে চিনতেন। সে-সময় অভয়পদ সোনারপুরে না বারুইপুরে কোন্ একটা হাই স্কুলে বি. এ. পাশ করে মাস্টারি করতে ঢুকেছেন। নিয়ামত আলি এসে বললেন, "অভয়দা, আমরা বাদা এলাকায় একটা জুনিয়ার হাই স্কুল করেছি। আপনি চলুন, আপনাকে আমরা হেডমাস্টার বানিয়ে নিয়ে যাব।"

তখন অভয়পদবাবুর বয়স কম। দায়দায়িত্বও খুব বেশি নেই। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নিয়ামত আলির প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং আগের ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সুন্দরবনের ভিতরে নিয়ামত আলির কর্মস্থল টেলারগঞ্জ নামে একটি ছোট জংলা দ্বীপ, সেখানে গিয়ে ডেরা বাঁধলেন।

বিশেষ প্রয়োজন না হলে পুজোর সময় মাসখানেক আর গরমের সময়

pathagar.net

মাসখানেক, বছরে মোটামুটি দু'মাস রঘুনাথপুরে এসে থাকতেন। আর শীতের সময় ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর কখনও-কখনও সপ্তাহখানেকের জন্য আসতেন।

টেলারগঞ্জে ভালই কাটিয়েছিলেন অভয়পদবাবু। চারদিকের নানা ছোট-বড় দ্বীপ থেকে নৌকোয় করে ছেলেরা পড়তে আসত। পরের দিকে মেয়েরাও আসত।

জুনিয়ার হাই থেকে হাই স্কুল, হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পথ ধরে শেষ পর্যন্ত মালটিপারপাস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পরিণত হয়েছিল বিদ্যালয়টি।

নিয়ামত আলির টাকাতেই স্কুলটা স্থাপিত হয়েছিল এবং তাঁর টাকাতেই চলত। মাইনেপত্র দেওয়ার ক্ষমতা ছাত্রদের বিশেষ ছিল না। নিয়ামত আলির ইচ্ছে ছিল কালিয়াপুরে যেমন ইন্দ্র সেন মেমোরিয়াল স্কুল আছে, তেমনই টেলারগঞ্জের স্কুলটার নাম দেন নিয়ামত আলি মেমোরিয়াল হাই স্কুল।

বহু কষ্টে নিয়ামত আলিকে অভয়পদবাবু বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, বেঁচে থাকতে মেমোরিয়াল স্কুল করা যায় না। কোনও অজ্ঞাত কারণে নিয়ামত-সাহেবের মেমোরিয়াল শব্দটার দিকে ঝোঁক ছিলও কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শুধু নিয়ামত আলি হাই স্কুল নামেই রাজি হয়েছিলেন।

নিয়ামত আলি অনেকদিন বিগত হয়েছেন। অভয়পদবাবুর ঢের আগে। নিয়ামত আলির ইচ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়েছে, তাঁর সুযোগ্য ছেলে কেয়ামত আলি বাবার নামে নিয়ামত মেমোরিয়াল কলেজ করেছে।

এসব কথা অবশ্য আমাদের এই কাহিনীতেই অপ্রাসঙ্গিক। রিটায়ার করার পর বাড়ি ফিরে বৃদ্ধ বয়েসে অভয়পদবাবু কেন রঘুনাথপুর দর্পণ বের করেছিলেন, সেই কথাটা বোঝানোর জন্য এত কথা বলতে হচ্ছে।

টেলারগঞ্জে খবরের কাগজ যেত না, তখন ঘরে-ঘরে রেডিও ছিল না। টেলারগঞ্জে অভয়পদবাবুর প্রথম দিকে প্রধান অসুবিধে ছিল বাইরের পৃথিবীর কোনও খবর পেতেন না। পরের দিকে ক্যানিং থেকে নৌকোয় প্রতি রবিবার দিন একসঙ্গে সাত দিনের পুরনো কাগজ আনিয়ে দিতেন নিয়ামত আলি।

pathagar.net

সেই সময়েই অভয়পদবাবুর মাথায় বিষয়টা ঢুকে গিয়েছিল। শুধু বড়-বড় শহরের থেকে কেন খবরের কাগজ বেরোবে। গ্রাম থেকেও বেরনো উচিত। আমেরিকায়ও তো তাই হয়।

তাঁর নিজের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক ছিলেন অভয়পদবাবু। অনেকগুলো গ্রাম মিলিয়ে যদি একটা কাগজ থাকে। আর সেই কাগজে যদি সাধারণ খবরের সঙ্গে সেইসব গ্রামের টুকরো খবর ছাপা হয়, তা হলে সেখানকার লোকেরা সেই কাগজ কিনে পড়বে, কিছু-কিছু বিজ্ঞাপনও দেবে।

সুন্দরবন থেকে রিটায়ার করার পর চলে এসে তাই প্রথমেই তিনি পত্রিকা বার করার কথা ভাবলেন। দৈনিক কাগজ নয়, সাপ্তাহিক অজ পাড়াগাঁয়ে দৈনিক কাগজ বার করা অসম্ভব আর প্রতিদিন সে কাগজ কিনবেই-বা কে আর বেচাই-বা যাবে কী করে।

পত্রিকা বার করার ব্যাপারে হেডমাস্টারি জীবনের শেষ পর্যায়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন অভয়পদবাবু। নিয়ামত আলি স্কুল থেকে বছরে একটি করে বার্ষিক ম্যাগাজিন বার করেছিলেন শেষের কয়েক বছর। সেখানেই তিনি কাগজের সাইজ, যথা ডিমাই কাকে বলে, ক্রাউন কাকে বলে, কিংবা রয়্যাল সাইজের কাগজ কী, সেই সঙ্গে কাগজের রকমফের, নিউজ প্রিন্ট, হোয়াইট প্রিন্ট ইত্যাদি বিষয়ে কাজ চলার মতো জ্ঞান লাভ করেন। তার পরে তাঁর স্কুলের এক নতুন মাস্টারমশাই, আগে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে এক প্রকাশকের দোকানে কাজ করতেন, অভয়পদবাবু তাঁর কাছ থেকে প্রুফ দেখা শিখে নিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের টাইপ, সাইজ, পাইকা, স্মল পাইকা এইসব জেনে নিলেন। কোথায় ব্লক করাতে হয়, লাইন ব্লক, হাফটোন ব্লক তার বিষয়েও তাঁর সামান্য অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। শেষের দিকে স্কুল ম্যাগাজিন ছাপার সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি নিজে দেখাশোনা করতেন এবং প্রয়োজনবোধে এইজন্য কষ্ট করে দু-একবার কলকাতায়ও গিয়েছেন।

ফলে রঘুনাথপুরে ফিরে এসে যখন শুনলেন যে, কাছেই রাউতারা বাজারের সানরাইজ প্রিন্টিং বন্ধ হয়ে আছে এবং সেই ছাপাখানার মালিক বাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছে, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রাউতারা গিয়ে সানরাইজের

pathagar.net

মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন।

সানরাইজের মালিক রবিবাবু বাজারের কাছেই থাকেন। বয়েস খুব বেশি হয়নি, কিন্তু বাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছেন। তাঁর পক্ষে আর ছাপাখানা চালানো অসম্ভব। সুতরাং অভয়পদবাবু যখন রবিবাবুর কাছে ছাপাখানার ব্যাপারে এলেন রবিবাবু হাতে চাঁদ পেলেন।

রাউতারার মতো ছোট জায়গায় একটা অচল ছাপাখানা বিক্রি করা কম কথা নয়। অভয়পদবাবুকে বেশ অল্প দামেই ছাপাখানাটা ছেড়ে দিলেন রবিবাবু আর সেইসঙ্গে ছাপাখানার ব্যবসার কিছু-কিছু গোপন কথা অভয়পদবাবুকে বলে দিলেন।

ছাপাখানা করতে গেলে, কাগজ বের করতে গেলে কিছু-কিছু আইন-আদালতের ব্যাপার আছে, সেগুলো সারতে প্রায় মাস কয়েক লাগল। তারপরে রাউতারা বাজার থেকে সানরাইজ প্রিন্টিং রঘুনাথপুরে উঠে এল রঘুনাথপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস হয়ে।

কয়েক মাসের মধ্যে প্রস্তুতি-পর্ব সারা করে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করল, অভয়পদ দাস সম্পাদিত সচিত্র রঘুনাথপুর দর্পণ, সংবাদ সাপ্তাহিক।

প্রথম-প্রথম প্রতি সপ্তাহে সোমবার দিন নিয়মিতভাবে রঘুনাথপুর দর্পণ প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন অভয়পদবাবু। কিন্তু সেটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। খবরের কাগজের পাতার এক-চতুর্থাংশ সাইজের সামান্য আট পৃষ্ঠার কাগজ। দৈনিক কাগজের দু' পৃষ্ঠার সমান কিন্তু তার লেখা আর সংবাদ সংগ্রহ করতে হিমশিম খেয়ে যেতেন অভয়পদবাবু।

অভয়পদবাবু চাইতেন ভাল-ভাল এবং চমকপ্রদ স্থানীয় সংবাদ বের হোক কাগজে। কিংবা স্থানীয় ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। যেমন, তাঁদের জায়গার নাম রঘুনাথপুর কেন?

এসব ব্যাপারে প্রথম দিকে গুরুতর অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল অভয়পদবাবুকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

স্থানীয় ডাকসাইটে ডাকার মহেন্দ্রচন্দ্র পাল এল. এম. এফ. আদ্যিকালের চিকিৎসক, প্রচুর খ্যাতি ও হাতযশ। বহু পুরুষ ধরে এ-অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। সকালে রাউতারা বাজারে ডিসপেনসারিতে

pathagar.net

"আমি ইংরেজি কাগজ ছাড়া অন্য-কিছু পড়িনা"...

pathagar.net

বসেন আর বিকেলে রোগী দেখেন রঘুনাথপুরে নিজের দোতলা বাড়ির একতলার টানা বারান্দায়।

মহেন্দ্রচন্দ্র পালকে স্থানীয় লোকেরা মহীপাল বলে। মহীপাল হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয় ডাক্তার হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। শোনা যায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত তাঁর প্রেসক্রিপশনকে গুরুত্ব দিতেন। সে-সময়কার বহু মুমূর্ষ রোগীর আত্মীয়স্বজন ডাক্তার বিধান রায়কে চিকিৎসার কাগজপত্র দেখিয়ে এসে বলত, "বিধান রায় বললেন, মহেন্দ্র পালের রোগীর কেসে আমি কী করব, মহেন্দ্র পাল কিছু কম বোঝে না।"

সেই মহেন্দ্র পালের কাছে রঘুনাথপুরের নামকরণের ইতিবৃত্ত জানতে গিয়ে অভয়পদবাবু প্রথম ধাক্কা খেয়েছিলেন।

রাউতারা বাজারে নয়, রঘুনাথপুরের বাড়িতে এক সন্ধ্যাবেলায় অভয়পদবাবু মহীপাল-ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মহীপাল যত ভাল ডাক্তার হোন না কেন, মানুষ হিসেবে সুবিধের নয়। গেটে কম্পাউন্ডারকে চার টাকা অগ্রিম ভিজিট দিতে হল মহীপাল-ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু লাভ হল না কিছু।

অবশ্য মহেন্দ্র পাল অভয়পদবাবুকে চেম্বারে প্রবেশ করা মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "হেড মাস্টারমশাই, কী হয়েছে আপনার?"

অভয়পদবাবু বললেন, "না, ডাক্তারবাবু, আমার কোনও অসুখ হয়নি। আমি একটা পত্রিকা বার করছি রঘুনাথপুর দর্পণ নামে, এখানেই ছাপা হবে। সেইজন্যে..."

কথা শেষ করার সুযোগ পেলেন না অভয়পদ, তার আগেই বাধা দিলেন মহেন্দ্র-ডাক্তার, বললেন, "কিন্তু সরি, ভেরি সরি, হেড মাস্টারমশাই আমি আপনার পত্রিকার গ্রাহক হতে পারব না। আমি ইংরেজি কাগজ ছাড়া অন্য-কিছু পড়ি না।"

অভয়পদবাবু সারাজীবন হেডমাস্টারি করেছেন, সবাই তাঁকে সমীহ করে কথা বলেছে, 'আপনি-আজ্ঞে' করেছে, নিজেও বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারী লোক। এ ধরনের গ্রাম্য আচরণ তাঁর পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন।

pathagar.net

অভয়পদের চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। যখন ইস্কুলে কোনও ছেলে বা মেয়ে বেয়াদপি করত, তিনি তাকে ডেকে এনে চোখ থেকে চশমা খুলে তার দিকে তাকাতেন। স্পষ্ট দেখতে পেতেন কোনও ছেলে কোলাব্যাঙ, কোনওটা খেঁকশেয়াল। খালি চোখে একবার একটা ঝগড়াটে মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখিয়েছিলেন একদম একটা মেঠো ইঁদুর ; যেন ধানখেতের গর্তের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে, গায়ে ধুলোমাটি লেগে রয়েছে। চোখ জুলজুল করছে।

আজ বেশ অনেকদিন পরে আবার চোখের চশমাটা খুলে অভয়পদ ডাক্তার পালের দিকে তাকালেন। পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে, ডাক্তার পালকে একটা খ্যাপা ঘোড়ার মতো দেখাচ্ছে।

ভয় পেয়ে গেলেন অভয়পদবাবু, তাঁর আশঙ্কা হল পাগলা ঘোড়াটা যে-কোনও সময় তাঁকে খিমচে দিতে পারে। তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে পরে নিলেন তিনি।

আবার যে-কে সেই। মহেন্দ্র-ডাক্তার খ্যাপা ঘোড়ার বেশ ছেড়ে সশরীরে বিদ্যমান হলেন। অভয়পদবাবু বুঝতে পেরেছিলেন এঁকে রঘুনাথপুর বৃত্তান্ত লেখার কথা অনুরোধ করে লাভ নেই। তবে এত দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন যখন একবার বলেই দেখা যাক।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে অভয়পদবাবু ডাক্তার পালকে বললেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে আমার কাগজের গ্রাহক করতে আসিনি। আমার কাগজ বেরোলে সে আপনি বিনা পয়সাতেই পাবেন। আমি এসেছি অন্য প্রয়োজনে।"

এবার মহেন্দ্র-ডাক্তার যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করলেন। বললেন, "বলুন, কী প্রয়োজন ?"

অভয়পদবাবু বললেন, "ডাক্তার পাল, আপনারা এ-অঞ্চলের অনেক কালের লোক। খুব প্রাচীন বংশ। রঘুনাথপুরের পুরনো কথা, কেন রঘুনাথপুর নাম হল, এসব যদি আমার কাগজে মাঝে-মধ্যে লেখেন, তা হলে বেশ ভাল হয়।"

কার যে কিসে দুর্বলতা, কেউ জানে না। অমন যে ডাকসাইটে ডাক্তার মহেন্দ্র পাল এ-প্রস্তাবে তিনি একদম গলে গেলেন।

pathagar.net

বাইরে রোগীর ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। মফস্বলের অন্ধকার রাত্রি জমাট বাঁধছে। এসব মোটেই হুঁশ না করে মহেন্দ্র-ডাক্তার অভয়পদবাবুর সঙ্গে পুরনো রঘুনাথপুর নিয়ে, রঘুনাথপুরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় বসলেন। দেখা গেল, ডাক্তারবাবু এসব নিয়ে অনেক ভেবেছেন এবং লিখবেন বলে ভাবেন কিন্তু সময় সুযোগ না থাকায় ঘটে ওঠে না। আজ যখন সুযোগ এসেছে।

কথাবার্তা বোধ হয় রাত পর্যন্ত গড়াত। কিন্তু এর মধ্যে একটা সাপে কাটা রোগী এসে যাওয়ায় হইচই ব্যস্ততায় আলোচনায় ছেদ পড়ল। তবু ডাক্তার পাল অভয়পদবাবুকে বলে দিলেন কয়েক দিনের মধ্যে কিছু লেখা তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

লেখা পেয়ে কিন্তু অভয়পদবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। লম্বা কবিতায়, কৃত্তিবাসী পয়ারে মহেন্দ্র-ডাক্তার সুললিত ভাষায় রঘুনাথপুর বৃত্তান্ত লিখেছেন :

রঘুনাথপুর ধাম মর্ত্যে স্বর্গপুরী।
কত শত খোকা খুকু বুড়া আর বুড়ি ॥
যুবক যুবতী আর শেয়াল কুকুরে।
জীবজন্তু গাছপালা রঘুনাথপুরে ॥
মিলেমিশে আনন্দিত সকলেই থাকে।
এই স্থানে ভালবাসে সবাই সবাকে ॥
রঘুনাথপুর কথা সচিত্র দর্পণ।
মহেন্দ্র-ডাক্তার লেখে পড়ে সর্বজন ॥

ওপাশে কালিয়াপুর হেথা ধুধু মাঠ।
এই পুরে নাই কোনো মূর্খ বা আকাট ॥...

কোনও কালেই কবিতার প্রতি তেমন আসক্তি ছিল না অভয়পদবাবুর। ডাক্তার মহেন্দ্র পালের কাব্যকাহিনী পাঠ করে তিনি বিচলিত বোধ করলেন। একদম বোকা বনে গেলেন।

কবিতা কবিতাই, কবিতা ইতিহাস নয়? মহেন্দ্র-ডাক্তারের

pathagar.net

রঘুনাথপুরের বৃত্তান্তে কাব্য হয়তো কিছুটা আছে, কিন্তু ইতিহাস একফোঁটা নেই। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, অকারণ প্রশংসা আর স্তাবকতায় ভর্তি, অলীক বর্ণনা।

ঘটনা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ডাক্তার মহেন্দ্র পালের সে কাব্যকাহিনী অভয়পদবাবু ছাপেননি।

এই শুরু। এর পর থেকে লেখা ছাপার ব্যাপার নিয়ে বারবার ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন অভয়পদবাবু। নিজের লেখা ছাপানোর জন্য, নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার জন্য প্রায় প্রতিটি লেখাপড়া-জানা লোকের আগ্রহ। আগ্রহ কেন রীতিমত মোহ রয়েছে। কিন্তু অনেক নামীদামি সম্ভ্রান্ত লোক এমন লেখা লেখেন যে, ছাপানো যায় না। তাঁদের কিন্তু ধারণা যে তাঁরা খুব ভাল লেখা লিখেছেন। লেখা ছাপা না হলে কেউ দুঃখিত হন, কেউ চটে যান, কেউ আবার খেপে যান।

লেখা ফেরত পেয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার খুব চটে গিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ বাড়াবাড়ি করেননি।

কালিয়াপুর স্টেশনে এক পাগল স্টেশনমাস্টার এসেছিলেন একবার। সে ভদ্রলোক সারারাত জেগে দিস্তার পর দিস্তা কাগজে যা-ইচ্ছে তাই লিখতেন। অধিকাংশই রেলগাড়ি বিষয়ে। সুখের কথা তিনি প্রথম প্রথম রঘুনাথপুর দর্পণের খোঁজ পাননি। তখন তিনি কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বাইরের সব কাগজে লেখা পাঠাতেন। বিদ্‌ঘুটে সেসব লেখা প্রায় সবই অমনোনীত হয়ে ফেরত আসত। আবার, কী আশ্চর্য, দু-একটা লেখা এদিকে-ওদিকে ছাপা হয়েও যেত।

একেবারে শেষের দিকে রঘুনাথপুর দর্পণের প্রতি স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের দৃষ্টি পড়ে। তখন তিনি প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। অভয়পদবাবুকে একটাই লেখা পাঠিয়ে ছিলেন, সে লেখা ছাপালে রেলপুলিশ অভয়পদবাবুকে ধরে নিয়ে যেত। রঘুনাথপুর দর্পণ নির্ঘাত উঠে যেত।

লেখাটার নাম ছিল, 'রেলটিকিট ফাঁকি দিবার সাতটি সহজ উপায়'।

এইরকম নামের একটি রচনা ছাপানোর সাহস ছিল না অভয়পদবাবুর,

pathagar.net

বাধ্য হয়েই তিনি ফেরত পাঠিয়েছিলেন লেখাটি। কিন্তু তার পরিণাম ভয়াবহ হয়েছিল। প্রত্যেক দিন গভীর রাতে অভয়পদবাবুর বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে স্টেশনমাস্টারমশাই বড়-বড় ইট পাটকেল ছুঁড়তেন রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসঘর লক্ষ করে। টিনের চালায় ঢেলা পড়ে জায়গায়-জায়গায় দুমড়ে গিয়েছিল। রাতের ঘুমও নষ্ট হত।

মাসাধিক-কাল চলেছিল এই অত্যাচার। অবশেষে থানায় নালিশ করবেন ভেবেছিলেন অভয়পদবাবু। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি, তার আগেই স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের আত্মীয়স্বজন এসে তাঁকে কালিয়াপুর থেকে ধরে সোজা রাঁচি মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল।

এসব অনেককাল আগেকার কথা। এই লেখার পাঠক-পাঠিকারা প্রায় কেউই তখন জন্মায়নি। তখন চৌষট্টি পয়সা, ষোলো আনার টাকার যুগ শেষ হয়ে এখনকার একশো পয়সার টাকার যুগ সদ্য শুরু হয়েছে। এই নতুন পয়সাকে সবাই বলছে নয়া পয়সা। রঘুনাথপুর দর্পণের দাম ছিল পুরনো দেড় আনা, ব্র্যাকেটে লেখা থাকত নয়া দশ পয়সা।

নয়া দশ পয়সার তখন মূল্য ছিল অনেক। তিনটে থিন এরারুট বিস্কুট পাওয়া যেত নয়-দশ পয়সায়, ওই খরচে ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার যাওয়া যেত ফার্স্ট ক্লাসে ট্রামে, আর দশ পয়সার খামে চিঠি দেওয়া যেত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

এসব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

আগে ভাল ছিলাম, এখন ভাল নেই, এসব ভাবতে মোটেই ভাল লাগে না।

কিন্তু তবুও তিরিশ বছর আগের মহেন্দ্র-ডাক্তারের লেখা ফেরত দেওয়ার পরের ঘটনাটা গল্পের খাতিরেই লিখতে হচ্ছে। সে-ঘটনা অবশ্য মধুর নয়। মহেন্দ্র-ডাক্তারের লেখা ফেরত দেওয়ার মাস-দুয়েক পরে একদিন অভয়পদবাবু শেষ রাতে গুরুতর আহত হলেন। অভয়পদবাবু ঘুম থেকে উঠতেন ভোর চারটে নাগাদ। তখনও অন্ধকার বিন্দুমাত্র কাটেনি, কয়েকটা বোকা কাক না বুঝে চেঁচায়, চেঁচিয়ে থেমে যায়। শেয়ালেরাও মাঠের মধ্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো

ডেকে যে-যার ঝোপে ফিরে যায়।

অভয়পদবাবু উঠে হাত-মুখ ধুয়ে একটু পুজো করতেন। তারপর যেতেন উঠোনের শেষ মাথায় ছোট গোয়ালঘরে। সেখানে দুটো গোরু ছিল, তার মধ্যে অন্তত একটা দুধেল অর্থাৎ সব-সময়েই হয় একটা গোরু নয় আর-একটা গোরু দুধ দিত।

নিজের গোরুর দুধ অভয়বাবু নিজে দুইতেন। এ-ব্যাপারে তিনি কারও উপরে নির্ভর করতেন না, অন্য কাউকে তাঁর গোরুর দুধ দুইতেও দিতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল দুজনের হাতে গোরুর দুধ দোয়া হলে সে গোরু বিগড়িয়ে যায়।

সে বছর কোনও কারণে অভয়পদবাবুর দুটো গোরুই দুধশূন্য হয়ে পড়ল। কোনওটারই একফোঁটা দুধ নেই। অনেক খোঁজখবর করে অভয়পদবাবু একটা খুব ভাল দুধেল গাই কিনলেন রাউতারা থেকে। কালো রঙের গোরু, কথায় বলে, কালো গোরুর দুধ ঘন হয়।

গোরু তো কিনলেন অভয়পদবাবু, কিন্তু সে গোরু ভয়ঙ্কর বেয়াদপ। আশপাশ দিতে যেতে গেলে শিং উঁচিয়ে গুঁতোতে আসে, সব-সময়ে ফোঁস ফোঁস করছে।

আগের গোরু দুটো ছিল নিরীহ, শান্তমতো। এই নতুন কালো গোরুটা এসে সে দুটোর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। থেকে-থেকেই তাড়া করে যায়।

গোরুটার পিছনের পা দুটো দড়ি দিয়ে জোড়া করে বেঁধে তারপর তাকে দুইতে বসতেন অভয়পদবাবু। সে ছিল খুবই কঠিন কাজ।

এই গোরুর বাছুরটাও ছিল খুব চনমনে। বিনা কারণেই সেটা মাঝেমধ্যে শূন্যে লাফিয়ে উঠত। গোরুটার থেকে একটু দূরে সেটাকেও শক্ত করে বেঁধে রাখতে হত। কিন্তু দুধ দোয়ার আগে বাছুরকে দিয়ে একটু দুধ খাইয়ে না নিলে গোরুর বাঁটে দুধ আসে না। একবার ওই বাছুরকে দুধ খেতে দিলে তাকে তার মায়ের কাছ থেকে ছাড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল।

এত সব কষ্ট করেও অভয়পদবাবু নিজেই সে গোরুর দুধ দোয়া আরম্ভ করলেন। তখনও তাঁর গায়ে বেশ শক্তিসামর্থ্য ছিল। শেষ রাতের

pathagar.net

গোয়ালে গোরু-বাছুরের সঙ্গে তিনি নিত্য লড়াই চালিয়ে সের দুই-আড়াই দুধ দুয়ে ফেলতেন।

একদিন দুর্ঘটনা ঘটল। কী কারণে যেন সেদিন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন অভয়পদবাবু। দুধ দোয়া প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে, এমন সময় কী এক রহস্যময় কৌশলে গোরুটা পেছনের জোড়া পায়ের দড়ির বাঁধনটা খুলে ফেলল এবং অভয়পদবাবু সাবধান হওয়ার আগেই একটু কোনাকুনি ঘুরে সজোরে পিছনের দুই পায়ে চাঁটি মারল। গোরু বা ঘোড়ার গায়ের লাথিকে চাঁটি বলে। সে খুব বিপজ্জনক জিনিস, বুকে লাগলে পাঁজর পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে।

এ দিন ভাগ্য ভালো বলে গোরুর মোক্ষম চাঁটিটা অভয়পদবাবুর বুকে লাগেনি। দুই হাঁটুর মধ্যে দুধ দোয়ানোর পেতলের বালতিটা ছিল, চাঁটিটা তার গায়ে লেগে বালতিটার ধাক্কা লাগে তার বুকে, তিনি অতর্কিতে চিত হয়ে পড়ে যান।

এর পরের ঘটনা আরও জটিল। তখন সদ্য ভোর হচ্ছে, আকাশ সবে ফরসা হতে শুরু করেছে। কাছাকাছি লোকজন বিশেষ কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। কোনওরকমে কাতরাতে-কাতরাতে শোয়ার ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগালেন অভয়পদবাবু। ভদ্রমহিলার চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়াসুদ্ধ লোক জেগে উঠল।

কয়েকজন দৌড়ে গেল মহেন্দ্র পাল ডাক্তারের বাড়ি, কাছাকাছি আর কোনও তেমন নির্ভরযোগ্য ডাক্তারবাবু ছিলেন না।

ডাক্তার মহেন্দ্র পাল, সংক্ষেপে মহেন্দ্র-ডাক্তার তখন ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সামনের রাস্তায় নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে পায়চারি করছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে, একজন গোরুর দুধ দুইতে গিয়ে গোরুর চাঁটি খেয়ে আহত হয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ধুয়ে তাঁর ডাক্তারির বাক্স নিয়ে ছুটলেন।

তিনি বোধ হয় একবারও ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে, তাঁর রোগীটি রঘুনাথপুর দর্পণের সম্পাদক অভয়পদবাবু। অভয়পদবাবুর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে তাঁর কেমন যেন খটকা লাগল, যারা তাঁকে আনতে গিয়েছিল, তাদের কাছে জানতে চাইলেন, "রোগী কে?"

pathagar.net

তারা যেই জানাল যে, রোগী হলেন গিয়ে অভয়পদবাবু, তিনিই গোরু দুইতে গিয়ে আহত হয়েছেন, মহেন্দ্র-ডাক্তার হঠাৎ রোগী না দেখেই পিছন ঘুরে হনহন করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

সঙ্গের লোকজন তো অবাক। এ আবার কী কাণ্ড। তারা "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু", করে পিছনে ছুটতে লাগল।

এ-এলাকার সবাই জানত যে, মহেন্দ্র-ডাক্তারের মাথায় বেশ খানিকটা গোলামাল আছে। কিন্তু এমন ঘটনা তারা আগে দেখেনি।

লোকজনের চিৎকারে মহেন্দ্র-ডাক্তার একবারও পিছনে ফিরলেন না। শুধু একজন দৌড়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে তিনি এক ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "গোরুতে চাঁটি মেরেছে তো আমি কী করব ? গোরুর ডাক্তার দেখাও।"

কেউই পুরনো ব্যাপারটা, মহেন্দ্র-ডাক্তারের কবিতা রঘুনাথপুর দর্পণে না ছেপে ফেরত দেওয়ার কথা জানে না, সুতরাং কেউই কিছু বুঝতে পারল না।

সে যাক, তখন সাইকেলে চড়ে লোক ছুটল কালিয়াপুরে এনামেল ফ্যাক্টরির ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

এদিকে সেই ডাক্তার আসার আগেই একটা মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটল। আধ-ঘন্টাখানেক পরে মহেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়ি থেকে এক ভৃত্য একটা কাগজ নিয়ে এল, এসে বলল, "ডাক্তারবাবু, প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সবাই তখন ভাবল, এতক্ষণে মহেন্দ্র-ডাক্তারের হুঁশ ফিরেছে। পাগলামিটা ছেড়ে যেতে একেবারে প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রোগী না দেখেই প্রেসক্রিপশন দিয়েছে। তা দিন, অভিজ্ঞ ডাক্তার এঁদের সব সময় রোগী দেখার দরকার পড়ে না।

একজন তখনই ছুটছিল রাউতারা বাজারে, একটা ওষুধের দোকানে, খুব সকালেই খোলে সেখানে। প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে সেখানেই ওষুধ আনতে যাচ্ছিল।

অভয়পদবাবু আহত হলেও গুরুতর চোট পাননি, অজ্ঞানও হয়ে যাননি। মহেন্দ্র-ডাক্তারের কীর্তিকলাপ তাঁর কানে কিছুটা পৌঁছেছিল।

pathagar.net

তিনি শোয়ার ঘরে খাটে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। এরই মধ্যে যখন শুনলেন যে, মহেন্দ্র-ডাক্তার তাঁকে না দেখে বাড়ি ফিরে গিয়ে ভৃত্যের হাত দিয়ে প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন, তিনি কৌতূহলভরে বললেন, "দেখি প্রেসক্রিপশনটা, মহেন্দ্র-ডাক্তার কী ওষুধ দিয়েছে।"

প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন অভয়পদবাবু। মহেন্দ্র-ডাক্তার নিজের প্যাডে নিজের হাতে এ কী উলটোপালটা বাংলা লিখে দিয়েছেন। ইংরেজিতে ছাপানো প্যাড, নীচে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা :

Dr. Mahendra Chandra Paul LMF

কালো গোরুর মিঠে চাঁটি।
দুধ খাও বাটি বাটি ॥

আখের গুড়ে শালুকডাঁটা

আবার জয়ন্তলালের কথায় ফিরে যাই। রণধীরবাবুর কবিতা সংশোধন করে বাড়ি ফিরে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জয়ন্তলাল কর্মকারের চোখে একফোঁটা ঘুম এল না। জানলার ওপাশে মুখ করে নিজের বিছানায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। যতদূর চোখ যায় চারদিকে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। আকাশে একটুকরো মেঘও নেই, বর্ষার শেষে বছরের এই সময়টায় সাদা কাগজের কুচির মতো হালকা মেঘ দেখা যায়, কিন্তু আজ রাতে তাও নেই। বোধ হয় সন্ধেবেলার ঝড়বৃষ্টিতে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

কিছু দূরে বড় রাস্তার মোড়ের বাঁ দিকে একটা ছোট গলির মধ্যে অনেক দিনের পুরনো রাধাকৃষ্ণের মন্দির, মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁষে বুড়ো তেঁতুল গাছ। সে-গাছ যে কতকালের তা কেউ জানে না। সেই গাছের ফোকরে-ফোকরে যত রাজ্যের পাখির বাসা। একজোড়া লক্ষ্মীপ্যাঁচাও সেখানে বহুকাল ধরে থাকে। রাতে প্যাঁচাজোড়া ধানখেতের আলে ও

বনেবাদাড়ে শিকার করতে যায়। মানে ইঁদুর, ব্যাঙ এইসব ধরতে যায়, তখন প্যাঁচার বাচ্চারা-মা বাবার জন্যে মানুষের বাচ্চার মতো ককিয়ে-ককিয়ে কাঁদে। এক-এক সময় মনে হয় সত্যিই বুঝি মানুষের বাচ্চা কাঁদছে।

এতক্ষণ বাচ্চা দুটো একটানা কেঁদেই যাচ্ছিল। একটু আগে থেমেছে। একটু আগে চাঁদটা বাড়ির পিছেন আমগাছটার আড়ালে নেমে গেছে। এবার চারদিকে আবছায়া অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে রয়েছেন জয়ন্তলাল। তাঁর মনে আজ পদ্যের ছোঁয়াচ লেগেছে। মাঝে-মাঝেই এরকম হয়, কিন্তু আজ কবিতার টানটা খুব বেশি।

সন্ধের পরে বাড়ি ফিরে সাইকেল থেকে নেমেই হাত-পা পর্যন্ত না ধুয়ে তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে ফাঁকা রাস্তায় জ্যোৎস্নার মধ্যে সাইকেল চালাতে-চালাতেই তাঁর মাথার মধ্যে খেলা করছিল চনমনে টাটকা কয়েকটা পঙ্‌ক্তি, সেটা তৎক্ষণাৎ কাগজে-কলমে আটকে ফেলেছিলেন—

নিরভিমান জীবনস্মৃতির
কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক
বাঁচতে গেলে খাদ্য চাই
ঘুমের জন্যে লেপ-তোশক ॥
লেখার জন্যে কাগজ চাই
কাগজ-কলম এবং মন
আখের গুড়ে শালুকডাঁটা
গরম ভাত রাঙাবরন ॥

এই আট লাইন তরতর করে লেখার পরে প্রায় দেড় ঘন্টা কাগজ-কলম খুলে বসে ছিলেন জয়ন্তলাল। আর এক পঙ্‌ক্তিও লিখে উঠতে পারেননি। মাঝে-মধ্যে দু-একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া লাইন মাথার ভিতরে ঘুরে গেছে, দুটো লাইন তো খুব ভাল মনে হয়েছিল : এই তো সুবজ, এই তো হলুদ/ দিন কেটে যায়, দিন কেটে যায়।

কিন্তু আগের আট লাইনের সঙ্গে এই দুটো লাইন কিছুতেই মেলাতে পারলেন না জয়ন্তলাল। অনেক চেষ্টা করে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুই করা গেল না।

আসলে পদ্যের ব্যাপারটা খুব গোল ‘লে। জয়ন্তলালও সেটা বেশ টের পেয়েছেন। বুদ্ধি খাটিয়ে, চেষ্টা করে পদ্য লেখা গেলে পৃথিবীটার চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। এখনও যে কারণে এক-এক গাছের আম টক হয়, অন্য গাছের আম মিষ্টি হয় ; গরমে দিন বড় হয়, শীতে দিন ছোট হয়, বর্ষার কালো মেঘ আশ্বিন মাসে এসে সাদা হয়ে যায়, সেই একই কারণে কারও কবিতা হয়, কারও হয় না। কখনও কবিতা হয়, কখনও হয় না।

অবশ্য এত সাদামাটা করে চিন্তা করছিলেন না জয়ন্তলাল। আজ তাঁর পুরো চিন্তাটাই এলোমেলো হয়ে গেছে। অনেক সময় চিন্তা জট পাকিয়ে যায়, একটু ঠাণ্ডা মাথায় চেষ্টা করলে সে জট ছাড়ানোও যায়। কিন্তু কবিতার ভাবনায় কোনও জট থাকলে চলে না, পুরো জিনিসটা কেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া, ছাড়া-ছাড়া হয়ে যায়। ওই শরৎকালের সাদা মেঘের মতোই এলোমেলো, ভাসা-ভাসা।

একবার খাতা-কলম ফেলে উঠে গিয়ে জয়ন্তলাল ঘাড়ে-মাথায় আর পায়ের গোড়ালিতে জল দিয়ে এলেন। এটা বহু দিনের পুরনো অভ্যেস জয়ন্তলালের, সেই ছাত্রজীবন থেকে। যখনই রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করতে হত মাঝে-মধ্যে উঠে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা জল ঘাড়ে মাথায় বুলিয়ে নিতেন, তাতে একটু আরাম হত।

আজ কিন্তু জল-চিকিৎসায় বিশেষ ফল হল না জয়ন্তলালের। কতক্ষণ লণ্ঠন জ্বালিয়ে, খাতা খুলে বসে ছিলেন কিছুই খেয়াল নেই, যখন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের পাশে তেঁতুলগাছের ডালে লক্ষ্মীপ্যাঁচার বাচ্চারা কান্না থামাল, যখন বাড়ির পিছনে আমগাছের আড়ালে গিয়ে জ্যোৎস্নার ঘোরটা কেটে গেল, জয়ন্তলাল টের পেলেন বোধ হয় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। হয়তো রাত কাবার হয়ে গেল। লক্ষ্মীপ্যাঁচার বাচ্চা দুটো কাঁদছে না, তার মানে তাদের মা-বাবা বাসায় ফিরে এসেছে, চাঁদও ডুবে গেছে। হয়তো কিছুক্ষণ পরেই কাক ডাকা আরম্ভ করবে।

pathagar.net

এবার অন্তত একটু ঘুমনো দরকার। লণ্ঠনটা নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্যে উঠে পড়লেন জয়ন্তলাল।

লণ্ঠনটা নিভিয়ে সবে বিছানার দিকে পা বাড়িয়েছেন জয়ন্তলাল, হঠাৎ সেই ছিঁড়ে যাওয়া লাইন দুটো ধাঁ করে ফিরে এল তাঁর মাথার মধ্যে—এই তো সবুজ, এই তো হলুদ/দিন কেটে যায়, দিন কেটে যায়।

এবং কী আশ্চর্য, সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেকগুলো পঙ্‌ক্তি তরতর করে নদীর স্রোতের পালতোলা নৌকোর মতো তাঁর মনের মধ্যে দ্রুত ভেসে এল।

আর লণ্ঠন জ্বালানো হল না।

আবছা অন্ধকারে অনুমান করে-করে কাগজের ওপরে কলম দিয়ে খসখস করে যা মনে এল লিখে ফেললেন জয়ন্তলাল। তারপর সেসব পড়ার চেষ্টা না করে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সারা দিন ও সারা রাত ক্লান্তির পর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমে ঢুলে পড়লেন তিনি।

ঘুম ভাঙলো পিসির ডাকে। বেলা তখন প্রায় ন'টা। ঘরের মধ্যে শরৎকালের ধবধবে রোদ জমজমাট আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

জয়ন্তলালের ডাকনামও জয়ন্ত, কিন্তু পিসি লালু বলে ডাকেন। সাতসংসারে পিসির লালু ছাড়া আর কেউ নেই। লালুর ঘুম থেকে উঠতে দেরি হচ্ছে বলে পিসি খুব দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন, তাঁর স্নেহের লালুর শরীরটরির খারাপ হয়নি তো। আবার, এইটুকু ছেলে সারাদিন এত খাটে, যদি সত্যিই ঘুমিয়ে থাকে, সে ঘুম ভাঙানোর ইচ্ছে ছিল না পিসির।

কিন্তু বেলা যখন ন'টা হয়ে গেল, লালু ঘুম থেকে উঠল না। পিসি খুব ভয় পেয়ে গেলেন। কী জানি কিছু হল কি না? বাবা-মা মরা তাঁর একমাত্র ভাইপো। তিনি আর থাকতে পারলেন না। জয়ন্তলালকে এসে ডাকলেন।

আজ এত বেলায় ঘুম থেকে উঠে জয়ন্তলালের কোনও অস্বস্তি হল না। বরং খুব ভাল লাগল এই দিনটাকে। কেমন যেন চেনা-চেনা খুব জানাশুনো একটা দিন। ধবধবে সাদা খণ্ড-খণ্ড রোদ। দরজার বাইরে

pathagar.net

ঝকঝক করছে বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশ, তার নীচে বর্ষাশেষের আমগাছের পাতায়-পাতায় ঘন সবুজের সমারোহ।

মন ভাল হয়ে গেল জয়ন্তলালের। আস্তে-আস্তে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি।

পিসি খুব খুশি, না লালুর শরীর খারাপ হয়নি। বেশি খাটাখাটুনি করে পরিশ্রান্ত হয়ে বেশি ঘুমিয়েছেন! এই তো তাঁর লালু, পরিতৃপ্ত প্রশান্ত মুখে বিছানায় বসে আছে।

না। লালুর কোনও অসুখ নেই, অসুখ হয়নি। লালুর কেন অসুখ হতে যাবে? শত্রুর হোক!

লালুর পিসি এরকম চিন্তা করলেন। কিন্তু তিনি জানেন না শত্রু কে। শত্রু জিনিসটা ঠিক কী, সে বিষয়েও তাঁর কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শত্রু দেখতে কীরকম হয়, শত্রুরা কী করে, শত্রু কেন হয় মানুষের, এসব সম্পর্কে বৃদ্ধা কিছুই জানেন না, শুধু এইটুকুই বোঝেন যে, শত্রু থাকা ভাল নয় এবং তাঁর পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতষ্পুত্রের কোনও শত্রু থাকলে সেটা তিনি মোটেই বরদাস্ত করবেন না।

পিসি বরদাস্ত করুন কিংবা না করুন, 'রঘুনাথপুর দর্পণ' কাগজ দেখাশোনা করতে গিয়ে ইতিমধ্যে জয়ন্তলাল কিন্তু গুটিকয় ছোটখাটো শত্রু বানিয়ে ফেলেছেন।

শত্রুদের কথা যথাসময়ে অন্যত্র বলা যাবে, আপাতত জয়ন্তলালের কাব্যচর্চার ব্যাপারটা শেষ করে নিচ্ছি।

পিসি হাতল-ভাঙা কাপে জয়ন্তলালকে চা এনে দিলেন, সঙ্গে একবাটি মুড়ি। জয়ন্তলাল একটু আগেই হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছেন। এখন বিছানায় বসে আরাম করে মুড়ি চিবোতে-চিবোতে চায়ের পেয়ালায় ধীরে চমুক দিয়ে তিনি তাঁর সৌভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলেন। এতকাল তিনি সাহিত্য-রসিক সমঝদার লোক ছিলেন, কিন্তু গতকাল রাতারাতি কবি হয়ে গিয়েছেন। ওই তো বিছানার পাশে পড়ে রয়েছে কয়েকটা এলোমেলো কাগজ, সকালবেলার মৃদু হাওয়ায় অল্প-অল্প দুলছে। বালিশ চাপা আছে একপাশে, তাই উড়ে যেতে পারছে না সেই কাগজগুলো। হাতের কাছে টেনে নিয়ে কাল রাতে লেখা নিজের কবিতার দিকে নিজেই

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন এবং সেই সঙ্গে আবার তাঁর মাথায় খেলা করতে লাগল আশ্চর্য সব কবিতার লাইন।

কাল রাতে খাপছাড়াভাবে সেই দুটো পঙ্‌ক্তি লিখে ফেলেছিলেন, এই তো সবুজ, এই তো হলুদ/ দিন কেটে যায়, দিন কেটে যায়।

আগের লাইনগুলোর সঙ্গে এই দুটো পঙ্‌ক্তির দূরত্ব অনেক, কিন্তু কিছুতেই মধ্যের লাইনগুলো বাগে আনতে পারেননি জয়ন্তলাল। অন্ধকারে ঘুমচোখে যা লিখেছিলেন এখন দেখলেন প্রায় সবই হিজিবিজি। কিন্তু আজ সকালের ঝলমলে রোদে, মধুর হাওয়ায় চায়ের ভাঙা পেয়ালায় আরাম ও পরিতৃপ্তির চমুক দিতে দিতে অতি অনায়াসে জয়ন্তলালের কলমে এসে গেল দুই দিকের যোগাযোগের পঙ্‌ক্তিগুলি।

বাজিকরের শূন্যে বলের পর বল ছুঁড়ে লুফে নেওয়ার মতো সাবলীল, তাস খেলায় বাঁটা হয়ে গেলে একটার পর একটা রঙিন তাস হাতে তুলে নেওয়ার মতো সহজ, পদ্মের পাতায় বৃষ্টির জলের মুক্তো হয়ে যাওয়ার মতো আশ্চর্য, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে সামান্য শিশুর চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক, একের পর এক গোনাগুনতি পর-পর চমৎকার ছ'টি নিটোল পঙ্‌ক্তি আজ জয়ন্তলালের ঝরনা কলমের চেরা নিব দিয়ে সত্যিই ঝরনার মতো লাফিয়ে পড়ল।

শেষ আট পঙ্‌ক্তি এই রকম দাঁড়াল—

অশথগাছের শিখরচূড়ায়
একটি সবুজপত্র কবে।
একা একাই অনন্তকাল
একা-একাই হলুদ হবে ॥
একটি পত্র যত্রতত্র
মহাকালের শিখরচূড়ায়।
এই তো সবুজ এই তো হলুদ
দিন কেটে যায় দিন কেটে যায় ॥

কবিতাটি এই পর্যন্ত শেষ করে বারবার পড়তে লাগলেন তিনি। কবিতাটি পড়ে জয়ন্তলাল অভিভূত হয়ে গেলেন। যেন কবিতাটি তাঁর

pathagar.net

নিজের লেখা নয়, যেন অন্য কোনও দূর দেশের দূর কালের অন্য কোনও কবি এসব পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিলেন।

ক্রমশ রোদ বাড়ছে, বেলা বাড়ছে। চড়চড় করে দিনের তাপাঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে। জয়ন্তলাল উঠে দাঁড়ালেন।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। এত দেরি করে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসে গেলে সম্পাদক রাগ করবেন। সম্পাদকমশাই আগে পুলিশের দারোগা ছিলেন। ভীষণ আইন মেনে চলেন। পুলিশ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয় জয়ন্তলালের। এম. এ পরীক্ষার সময় পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঠিক দুদিন আগে পরীক্ষা দিয়ে ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে কলুটোলার গেটে দুই পরস্পর বিরোধী ছাত্রদল এবং পুলিশের লাঠির মধ্যে পড়ে জয়ন্তলাল লাঠি, বোমা কিংবা জনতার পদাঘাতে বা হস্তাঘাতে অজ্ঞান হয়ে যান এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন।

জয়ন্তলালের চোট তেমন অবশ্য লাগেনি। কিন্তু বাকি এম. এ. পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়নি। লোকে তাঁকে আড়ালে-আবডালে এম. এ. ফেল বলে বটে, কিন্তু তিনি এম. এ. ফেল মোটেই নন, ড্রপ করেছিলেন, বলা যেতে পারে এম. এ. অনুপস্থিত। সে যা হোক, এখন আর তাঁর এম. এ. পাশ করার মোটেই ইচ্ছে নেই। সেই দুর্ঘটনার পর তাঁর এসব ব্যাপারে ঘেন্না ধরে গেছে।

এরপর বিনা কারণেই পুলিশ জয়ন্তলালের পিছনে লাগল। হাসপাতালে এসে সাদা-পোশাকে পুলিশ তাঁকে জেরা করে জেরবার করে দেয়। তাঁর পক্ষে বোঝানোই দুষ্কর হয়ে পড়ে যে তিনি কোনও দলে নেই, সাতে নেই পাঁচে নেই। ওই মারামারির বিন্দুবিসর্গ তিনি জানতেন না, একেবারে কিছুই না বুঝে গোলমালের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর যে কোনও দায়িত্ব নেই একথা পুলিশ সহজে বোঝেনি।

এই ঘটনার পর আর কখনও বিশ্ববিদ্যালয়মুখো হননি জয়ন্তলাল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন। তারপর বহুদিন কলকাতার দিকেও পা বাড়াননি। যেতে ইচ্ছেই করেনি, প্রয়োজনও পড়েনি।

যদিও জয়ন্তলালের ধারণা যে, তিনি জীবনে প্রথম কবিতা কাল

pathagar.net

রাতেই লিখেছেন কিন্তু সেটা সত্যি নয়। জয়ন্তলাল ভুলে গেছেন যে, হাসপাতালে থাকার সময় পুলিশ যখন তাঁকে নিয়মিত জেরা করছিল এবং নজরে রাখছিল, তখনই তিনি দুটি স্তবক পদ্য লিখেছিলেন আহত অবস্থায় ভাঙা হাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। খুবই তিক্ত সে দুটি পদ্য।

ভিজিটিং আওয়ারে পুলিশরা রোগীদের ভিজিটরদের সঙ্গে মিলে লুকিয়েচুরিয়ে দেখত এবং শুনত কারা-কারা তাঁর কাছে আসে; আর কী বলে। তা ছাড়া অন্যান্য সময় কখনও ডাক্তার সেজে, কখনও ঝাড়ুদার সেজে আবার কখনও-বা পুলিশের পোশাকেই দলে-দলে পুলিশ তাঁকে ঘিরে ডিউটি করত। এই পুলিশের প্রায় সবাইকে হাসপাতালে চার সপ্তাহ বাসকালে চিনে ফেলেছিলেন জয়ন্তলাল।

ইউনিফর্ম-পরা পুলিশেরা যারা তাঁকে এক-একদিন জেরা করতে আসত তারা খুব কেতাদুরস্ত ছিল। তারা জয়ন্তলালকে মিঃ কর্মকার বলে সম্বোধন করত। সাদাসিধে গ্রামের যুবক জয়ন্তলালের মিস্টার কথাটা শুনে হাসি পেত, জয়ন্তলাল থেকে মিস্টার কর্মকার হাওয়ার জন্যে তাঁকে কোনও পরিশ্রমই করতে হয়নি। শুধু একটু, ঠিক একটু নয়, একটু চেয়ে একটু বেশি মার খেতে হয়েছে তাঁকে এবং সে কারণে হাসপাতালে আসতে হয়েছে। সেই সঙ্গে একটা বড় ক্ষতি হয়েছে, এম. এ. পরীক্ষাটা এ-জন্মের মতো সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে গেছে।

এসব নিয়ে জয়ন্তলালের মনে এখন আর কোনও দুঃখই নেই। রঘুনাথপুর দর্পণে মনের মতো কাজ পেয়ে তিনি খুশি। তাঁর তেমন কোনও উচ্চাশা নেই, চাহিদাও যৎসামান্য। সেই সঙ্গে দায়দায়িত্ব বিশেষ কিছু নেই।

সে যা হোক, জয়ন্তলাল কর্মকারের আজ আর মনে নেই কিন্তু সঠিক কথাটা হল যে, ওই হাসপাতালে রচিত দুটি পদ্যই তাঁর জীবনের প্রথম কবিতামালা।

দুটি পদ্যেই যথেষ্ট শ্লেষ আছে। প্রথমটিতে সরাসরিই জয়ন্তলাল লিখেছিলেন—

ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।

pathagar.net

তোমাদের বিদ্যাখানি ॥
জানি জানি পুলিশ জানি।
তুমি চাও না-বলা বাণী ॥

ওই পদ্যটি যথেষ্টই সরল, কিন্তু পরের পদ্যটি ছিল বড় বেশি জটিল ও ঘোরাল এবং অপমানসূচক। এই পদ্যটি হাতে পেলে জয়ন্তলালের ওপর পুলিশের রাগ এবং সন্দেহ ঘনীভূত হত।

জয়ন্তলাল বোকা লোক নন বরং বুদ্ধিমানই বলা চলে। তিনি সরল হতে পারেন কিন্তু নির্বোধ নন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পদ্যের টুকরোগুলো এই অবস্থায় পুলিশের হাতে পড়লে ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা, তাই প্রথম পদ্য সমেত দ্বিতীয় পদ্যটাও তিনি লেখার একটু পরেই টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে হাসপাতালের দোতলার জানলা দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেন। সেইজন্যই জয়ন্তলালের এখন আর সে কবিতাগুলোর বিষয়ে কিছুই মনে নেই। তবু উপন্যাসের খাতিরে দ্বিতীয় পদ্যের টুকরোটাও এখানে লিখে রাখা উচিত।

পদ্যটির মধ্যে শুধু শ্লেষ নয়, যথেষ্ট কায়দাও রয়েছে। বলা হয়েছে—

ঝোলে ঝালে অম্বলে
ছলে বলে কৌশলে
তুমি থাকো তলে তলে
আমরা কি জানি না ?
টিকটিকি দলে দলে
আসে আর যায় চলে
কী যে হয় তার ফলে
আমরা কি জানি না ?

অতঃপর বোঝাই যাচ্ছে যে, পুলিশ সম্পর্কে জয়ন্তলালের ধারণা খুব মধুর নয়। মধুর হওয়ার কথাও নয়।

ফলে রঘুনাথপুর দর্পণে কাজ নেবার কিছুদিন পরে যখন তিনি জানলেন যে, সম্পাদক গুরুপদবাবু পুলিশের প্রাক্তন দারোগা, জয়ন্তলালের মনে কেমন সংশয় দেখা দিল। তাঁর এক-এক সময় মনে

pathagar.net

আমাকে কি ফেরারি মনে হচ্ছে তোমার?

pathagar.net

হত হাসপাতালে যারা জেরা কিংবা গোয়েন্দাগিরি করতে যেত, তাদের মধ্যে এই গুরুপদবাবুও ছিলেন।

গুরুপদবাবু যখন অন্যমনস্ক থাকতেন বা কোনও কাজে অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মুখের দিকে জয়ন্তলাল অপলক এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন। এক-এক সময় মুখটা খুব চেনা মনে হত, সেই হাসপাতালে থাকার সময়েই হয়তো দেখা।

একদিন গুরুপদবাবু মাথা নিচু করে সামনের সংখ্যা রঘুনাথপুর দর্পণের জন্যে সম্পাদকীয় লিখছিলেন, একটু দূর থেকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করছিলেন জয়ন্তলাল।

হঠাৎ গুরুপদবাবু মুখ তুলে তাকাতে জয়ন্তলাল ধরা পড়ে গেলেন। এইরকম পর-পর দু-চার দিন হওয়ার পর গুরুপদবাবু সোজাসুজি জয়ন্তলালকে বললেন, "পুলিশে থাকার সময় ফোটো মিলিয়ে আমরা রেফারি আসামিকে খুঁজতাম, সেভাবে তুমি আমার ছবি মেলাচ্ছ মনে হচ্ছে। আমাকে কি ফেরারি মনে হচ্ছে তোমার? আমার নামে কি হুলিয়া বেরিয়েছে?"

এ-প্রশ্নের জয়ন্তলাল কোনও উত্তর দিতে পারেননি। বরং আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে তো-তো করেছেন। ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে মিটে গেছে।

কিন্তু গুরুপদবাবু সম্পর্কে জয়ন্তলালের মনের মধ্যে ভয়টা এখনও কাটেনি।

হামানদিস্তা

গুরুপদবাবু আগে পুলিশ ছিলেন, এখন রঘুনাথপুর দর্পণের সম্পাদক। কিন্তু তিনি একরোখা প্রকৃতির লোক, সব জিনিস সোজাসুজি দেখেন খুব বেশি, বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাই বলে তাঁকে ঠিক বোকাসোকা ভাবা উচিত হবে না। গোবেচরা স্বভাবের ব্যক্তিও নন তিনি। তাঁর চরিত্রে একটা শক্ত ভাব আছে, কোথাও একটা আত্মপ্রত্যয় আছে।

pathagar.net

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, গুরুপদবাবু ভালভাবেই জানেন যে, তিনি নিজে খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান বা চৌকস লোক নন। তিনি এটাও জানেন যে, সদাসর্বদা খুব বিদ্যা বা বুদ্ধির দরকার পড়ে না। এবং তাঁর এই সহজ জ্ঞানটাই তাঁর চরিত্রে শক্তি জুগিয়েছে।

জয়ন্তলালকে গুরুপদবাবুর বেশ পছন্দ। ছোকরার কলমে জোর আছে, সাহিত্যে বোধ আছে। কিন্তু ছোকরা বড় ভাবালু-প্রকৃতির। এসব লোক জীবনে খুব কষ্ট পায়। পুলিশের চাকরিতে তিনি অনেক দেখেছেন। ভাবালু-স্বভাবের লোকেদের বিপদে পড়ার একটা প্রবণতা আছে।

গুরুপদবাবু আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছেন যে, জয়ন্তলাল অনেক সময় তাঁকে গোপনে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর কেমন সন্দেহ হয় ছোকরা হয়তো কখনও পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে ছিল এবং সেই সময় পুলিশের দারোগা হিসেবে তিনি তদন্তকারী অফিসার ছিলেন।

সে যাই হোক, আজ এই মুহূর্তে একটি কঠিন কাজ করছিলেন গুরুপদবাবু।

সকাল প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। প্রত্যেকদিন দশটার মধ্যে জয়ন্তলাল কাজে এসে যান। কিন্তু আজ এখনও আসেননি। জয়ন্তলাল সাধারণত এমন করেন না। আজ কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

শারদীয় দুর্গোৎসব এসে গেছে। আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে চারদিকে একটা সাজসাজ ভাব। আকাশ ঝকঝকে নীল, গাছের পাতা ঝলমলে সবুজ। বাড়ির পিছনের পুকুরে লাল রঙের শালুক ফুটেছে অজস্র। একটু আগেই একঝাঁক টিয়াপাখি উড়ে এসেছিল কোথা থেকে, সামনের চক্রবর্তী বাড়ির আমবাগানে ঢুকে এখন গাছের পাতার সঙ্গে মিশে গেছে। বোধ হয় ওই বাগানের ওপাশটায় একটা কাঁচালঙ্কার খেত আছে। টিয়ার ঝাঁক সেখানেই যাবে। কাঁচালঙ্কার খেতের সর্বনাশ হবে।

জয়ন্তলালের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে বাড়ির ভিতরের দরজা দিয়ে এবং বাইরের জানলা দিয়ে এসব জিনিস দেখছিলেন গুরুপদবাবু। তাঁর মনে বা হৃদয়ে তেমন কোনও কবিত্বভাব নেই, এসব দৃশ্য দেখে খুব

pathagar.net

একটা আবেগ তাঁর হয় না। তবে ভাল লাগে।

জয়ন্তলাল আসছেন না দেখে গুরুপদবাবু নিজেই খাতা-কলম খুলে বসেছেন।

রঘুনাথপুর থেকে মোটামুটি আট কিলোমিটার, পুরনো হিসেবে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বল্লভপুর গ্রাম। গ্রাম না বলে শহর বলাই উচিত। দুটো সিনেমা হল আছে, কলেজ আছে, থানা আছে, বি ডি ও অফিস অছে—বেশ প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু এলাকা।

সেই বল্লভপুরে অনেকদিন ধরে রঘুনাথপুর দর্পণের বেশ কয়েকজন পুরনো গ্রাহক আছে। এ-বছর বল্লভপুর গ্রামসেবা সঙ্ঘের বারোয়ারি দুর্গোৎসবের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উপলক্ষে দুর্গোৎসব কমিটি রঘুনাথপুর দর্পণের সম্পাদক হিসেবে গুরুপদবাবুর কাছে একটি শুভেচ্ছাবাণী চেয়েছে।

অনেকদিন আগেই অনুরোধটা এসেছে। গুরুপদবাবু এতদিন ফেলে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন এক সময় জয়ন্তলালকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন। এসব জিনিস তাঁর কলমে ভাল আসে না।

আজ সকালে সাইকেলে করে বল্লভপুর থেকে এক যুবক এসেছেন শুভেচ্ছাবাণীটি নিতে, আজই চাই। কলকাতায় বড় প্রেসে স্যুভেনির ছাপা হবে, পুরো পাণ্ডুলিপি আগামীকাল সকালে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে।

গুরুপদবাবু যুবকটির কাছ থেকে এক ঘন্টা সময় নিয়েছেন। যুবকটি এখান থেকে গিয়েছেন মহেন্দ্র-ডাক্তারের কাছে। সেই মহেন্দ্র ডাক্তার, যিনি পয়ারে রঘুনাথপুর বৃত্তান্ত লিখেছিলেন, যে কবিতা অভয়পদবাবু মানে গুরুপদবাবুর জ্যাঠামশায় রঘুনাথপুর দর্পণের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক না ছেপে ফেরত দিয়েছিলেন।

মহেন্দ্র-ডাক্তার এখন বেশ বুড়ো। আগের দিনের মতো শক্ত-সমর্থ না থাকলেও এখনো বেশ সচল আছেন, তবে সেদিনের সেই প্রবল প্রতাপ আজ আর তাঁর নেই। কিন্তু প্রবীণ চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতিটা এখনও রয়েছে। সেইজন্য তাঁর কাছেও বল্লভপুর গ্রামসেবা সঙ্ঘ আশীর্বাণী চেয়েছে।

pathagar.net

যুবকটি যে-কোনও সময় ঘুরে আসবেন। এদিকে কিন্তু জয়ন্তলালের দেখা নেই। কী যে হল ছোকরার।

গুরুপদবাবু নিজেই কাগজ-কলম নিয়ে শুভেচ্ছাবাণী লিখতে বসলেন। অনেক কাটাকুটি করে, অনেক মাথার ঘাম টেবিলে ফেলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল সে এইরকম—

'দেশ, জাতির ও মানুষের এই ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন দুর্দিনে বল্লভপুর গ্রামসেবা সঙ্ঘ মহাদেবী মহামায়ার পুণ্য আরাধনার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্যুভেনির প্রকাশে ব্রতী হইয়া আপামর জনসাধারণের নিকট যে মহান এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা বাংলার অন্ধকার ঘরে ঘরে প্রদীপশিখার মতো প্রজ্জ্বলিত হউক।

শুভ্র গোলাপের মতো ছোট-ছোট খোকাখুকু-ভাইবোনদের মুখে আবার আগের মতো হাসি ফুটিয়া উঠুক।'

বহু পরিশ্রমে এই দুই লাইন আশীর্বাণী রচনা করে খুব পরিতৃপ্ত বোধ করলেন গুরুপদবাবু। বিশেষ করে শেষ পঙ্‌ক্তিটি ওই 'শুভ্র গোলাপের মতো খোকাখুকু' ইত্যাদি সুন্দর-সুন্দর কথা তাঁর কলমে কী করে যে চলে এল তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন এবং সেই সঙ্গে অভিধান খুলে পুণ্য, আরাধানা, সুবর্ণ ইত্যাদি শব্দে কোন 'ন' হবে সেটা খুঁজে-খুঁজে নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন।

এমন সময় দ্রুত সাইকেল চালিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে জয়ন্তলাল এলেন। এসেই বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে।"

জয়ন্তলালের কথা শুনে গুরুপদবাবু হঠাৎ চমকে উঠলেন, তাঁর হাত থেকে অভিধানটা পড়ে গেল, সেটা কুড়িয়ে তুলতে তুলতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কী সর্বনাশ?"

সাইকেলটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসের মধ্যে ঢুকে জয়ন্তলাল জিজ্ঞেস করলেন, "বল্লভপুর থেকে আজ সকালে কেউ আপনার কাছে শুভেচ্ছাবাণী নিতে এসেছিলেন?"

কিছুই বুঝতে না পেরে গুরুপদবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সে তো মহেন্দ্র-ডাক্তারের ওখানে গেছে। তার কী হয়েছে?"

একটু দম নিয়ে জয়ন্তলাল বললেন, "তাঁর মাথা মহেন্দ্র-ডাক্তার

pathagar.net

হামানদিস্তার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। এইমাত্র তাকে রিকশয় করে কালিয়াপুর এনামেল কারখানার হাসপাতালে নিয়ে গেল।”

বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত করে বলা দরকার।

বল্লভপুর থেকে যে যুবকটি আজ সকালে সাইকেলে শুভেচ্ছাবাণী নিতে এসেছেন তাঁর নাম নিখিল চক্রবর্তী। তিনি বল্লভপুর গ্রামসেবা সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং সুবর্ণজয়ন্তী দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন বিশেষ কমিটির স্মারকগ্রন্থ উপ-কমিটির অন্যতম সহকারী সম্পাদক। এ ছাড়াও আরও পাঁচজন সহকারী সম্পাদক আছেন ওই উপ-কমিটিতে। বলা বাহুল্য সর্বত্রই যেমন বল্লভপুর গ্রামসেবা সঙ্ঘের বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি থেকে শুরু করে কোষাধ্যক্ষ পর্যন্ত সমস্ত পদেই পদাধিকারীর সংখ্যা অনেক। স্মারকগ্রন্থের অন্তত চার পৃষ্ঠা লেগে যাবে এদের সকলের নাম ছাপতে। তা ছাড়া পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের নাম, যাঁদের মধ্যে থানার বড়বাবু থেকে প্রাক্তন এম এল এ, এমনকী দূরবর্তী গুরুপদ-সম্পাদক বা মহেন্দ্র-ডাক্তারের মতো ব্যক্তিও আছেন, সেও এক ভয়াবহ দীর্ঘ তালিকা। এর ওপরেও আছে শিশুসভ্যদের নামাবলী, তবে সুখের কথা সেখানে বাচ্চু, খোকন, মামণি, বাবু, সোনা-এইরকম উপাধি বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করে শুধু ডাকনাম ছেপে দিলেই হয়।

এসব অবশ্য অতি অবান্তর কথা এবং সকলেরই জানা। আজকের নিখিল চক্রবর্তীর প্রহৃত হওয়ার সঙ্গে এসবের কোনও যোগ নেই। সে-ব্যাপার এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল।

এ-ক্ষেত্রেও মহেন্দ্র-ডাক্তার সুললিত পয়ারে চমৎকার একটি শুভেচ্ছাবাণী সুবর্ণজয়ন্তী দুর্গোৎসবের জন্য লিখে রেখেছিলেন, লেখাটি তাঁর টেবিলের দেরাজের মধ্যেই ছিল।

মাত্র কয়েক লাইন পদ্য, প্রতিদিন সকালেই টেবিলের দেরাজ খুলে পদ্যটা বার করে পড়েন মহেন্দ্র-ডাক্তার আর প্রত্যেকদিনই বেশ কাটাকুটি অদলবদল করেন। আজও তাই করছিলেন।

টেবিলের ওপরেই হামানদিস্তা রয়েছে আর পাশেই পানের বাটা ভর্তি মিঠে পান, সুপুরি, জরদা এবং নানারকম মসলা। অল্প অল্প করে পানের পাতা ছিঁড়ে, একটু চুন আর খয়ের লাগিয়ে সঙ্গে পরিমাণমতো সুপুরি,

জরদা, মসলা দিয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার সকাল থেকে হামানদিস্তায় ক্রমাগত ছেঁচতে থাকেন, এইভাবে পান সুপুরি জরদার যে মণ্ড তৈরি হতে থাকে তাই চামচে দিয়ে অল্প-অল্প তুলে মুখের মধ্যে ঢোকান। নিজের ইচ্ছে ও রুচিমতো এক-এক সময় সুপুরি, জরদা বা অন্য মসলার পরিমাণ কমান-বাড়ান।

মহেন্দ্র-ডাক্তারের কবিতা কাটাকুটি করা ছাড়া, এখন সারাদিন ধরে একমাত্র কাজ, হামানদিস্তায় পান ছেঁচা আর সেই ছেঁচা পান অল্প-অল্প করে মুখে ফেলা। এ ছাড়া তাঁর আর কোনও কাজ নেই। আগে অল্প-অল্প বিড়ি তামাক খেতেন, শেষের দিকে যৎকিঞ্চিৎ আফিমের নেশাও ধরেছিলেন। কিন্তু সেসব তিনি আজকাল ছেড়ে দিয়েছেন।

রোগী দেখাও ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। সেই যেবার তাঁর সত্তর বছর বয়স হল, তখন রোগী এমনই কমে গেছে, একদিন সন্ধেবেলা আফিম খেয়ে বাইরের ঘরে ঝিমোচ্ছিলেন, হঠাৎ একদল ছেলে হুড়মুড় করে একটি অজ্ঞান ছেলেকে কোলে করে নিয়ে এল। ছেলেটি ফুটবল খেলতে গিয়ে একটা বল হেড করার সময় বলের বদলে লক্ষ্য ভুল করে রেফারির নিরেট গোল মাথায় গুঁতো মারে। রেফারির কিছু হয়নি। শুধু অতর্কিতে হুইসল বেজে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি বেহুঁশ হয়ে যায়।

সেই বেহুঁশ ছেলেটিকে অন্য ছেলেরা যখন পাখা দিয়ে হাওয়া করে, চোখেমুখে জল ছিটিয়ে কিছুতেই জ্ঞান ফেরাতে পারেনি, তখন তারা হাতের কাছে অন্য ডাক্তার না থাকায় বৃদ্ধ মহেন্দ্র-ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

মহেন্দ্র-ডাক্তার হঠাৎ আফিমের ঝিমুনি ভেঙে ধড়মড় করে জেগে উঠে ঘরভর্তি ছেলেদের দেখে এবং সেই সঙ্গে তাদের কোলে একটি বেহুঁশ ছেলেকে দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন, নিশ্চয় সাপেকাটা রোগী। আফিম খাওয়ার জন্যে অথবা বুড়ো বয়েসের কারণে তিনি এরকম ভুল করলেন তা নয়, এটা খুবই স্বাভাবিক ভুল। পরিস্থিতি তাঁকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। যে-কোনও ডাক্তারই কখনও-না-কখনও এরকম ভুল করে থাকেন।

মহেন্দ্র-ডাক্তার পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। সব-সময়েই নিজের কাছে বেশ

pathagar.net

কয়েকটা অ্যানটি ভেনোম ইঞ্জেকশন রাখেন, অ্যানটি ভেনোম মানে বিষক্রিয়া নিবারক ইঞ্জেকশন, সাপের কামড়ের চিকিৎসায় একমাত্র ওষুধ। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ডাক্তারির বাক্স খুলে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর অ্যানটি ভেনোমের অ্যামপিউল বার করে অজ্ঞান ছেলেটিকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেন।

এর পরে যা হয়েছিল সে সাত কাহনের বিশদ বিবরণ দিতে গেলে কারও ধৈর্যে কুলোবে না।

শুধু দুটি কথা না বললে অন্যায় হবে।

এক, মহেন্দ্র-ডাক্তারের ভুল অ্যানটি ভেনোম ইঞ্জেকশন দেওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যে মহেন্দ্র-ডাক্তারেরই পরামর্শে এবং অন্যান্য গুণী ও গুনিনদের নির্দেশে বেহুঁশ ছেলেটিকে রাউতারা বাজারের মাছের গুদামের পিছনের মাঠে ফেলে রাখা হয়।

কারণ ওই রকম কেউটে অধ্যুষিত অঞ্চল এই এলাকায় আর কোথাও নেই। সাপের বিষের ইঞ্জেকশন নেওয়া রোগী সাপের কামড়ে সুস্থ হয়ে যাবে এই ভেবে এটা করা হল। ফল খারাপ হয়নি। এক ঘন্টার মধ্যে ছেলেটিকে সত্যি-সত্যি কেউটে শেষ পর্যন্ত দংশন করেছিল কি না অদ্যাবধি জানা যায়নি, রাউতারা বাজারের পিছনের মাঠ থেকে সহসা জ্ঞান ফিরে পেয়ে অন্ধকারে জেগে উঠে 'গোল' 'গোল', চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে।

দুই, এই ঘটনার পরে মহেন্দ্র-ডাক্তার রোগী দেখা একেবারে বন্ধ করেন। পরের শীতে বেনারস বেড়াতে গিয়ে তিনি একটা নৌকো ভাড়া করে মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে পঞ্চাশ বছরের সুখ-দুঃখের বহু জীবন-মৃত্যুর সঙ্গী স্টেথিসকোপটাকে পবিত্র গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে দেন। এবং এর পর আর কোনও কারণেই কোনও রোগীর নাড়ি ধরেও দ্যাখেননি। কারও কোনওরকম চিকিৎসাও করেননি।

আজকাল সকাল থেকে সারাদিন মহেন্দ্র-ডাক্তার স্নান-খাওয়ার সময়টকু বাদ দিয়ে বাইরের ঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে থাকেন। সারাদিন ধরে হামানদিস্তায় পান ছেঁচছেন তো ছেঁচছেনই। এরই মধ্যে এক-এক সময় টেবিলের দেরাজ খুলে মোটামতো একটা কয়েক বছরের পুরনো

ডায়েরি বার করে মিলিয়ে মিলিয়ে শব্দ মিলিয়ে বিশুদ্ধ পয়ারে কীসব লেখেন।

লোকে বলে ডাক্তার মহেন্দ্র পাল আত্মজীবনী লিখছেন, কিন্তু ব্যাপার ঠিক তা নয়। তিনি যখন যে-বিষয়ে ইচ্ছে হয় খসখস করে লিখে যান, যেমন কাল দুপুরেই কলার মোচা ও থোড়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা পদ্যে লিখেছেন, যার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি হল—

থোড় হল সাদা আর মোচা হল কালো
থোড় হল ভাল আর মোচাও তো ভাল
থোড় আর মোচা খাও, মোচা আর থোড়,
যত খাবে তত মজা, গায়ে হবে জোর।

এরকম অজস্র কবিতা লিখেছেন মহেন্দ্র পাল। সুতরাং কবিতায় বল্লভপুর সুবর্ণজয়ন্তী দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছাবাণী লিখতে তাঁর কোনও কষ্টই হয়নি। কিন্তু বারবার কাটাকুটি করে কবিতাটি শেষের দিকে একটু খটমট হয়ে যায়।

আসলে বল্লভপুর থেকে শুভেচ্ছাবাণী নিতে অনেক আগেই আসার কথা ছিল। সুবর্ণজয়ন্তী সমিতি চিঠি দিয়েছিল, সেই আষাঢ় মাসের প্রথমে। আজ এই এতদিনে নিখিল চক্রবর্তী লেখা সংগ্রহ করতে এসেছেন।

রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস থেকে বেরিয়ে নিখিলবাবু যখন মহেন্দ্র-ডাক্তারের ওখানে গেলেন তখন তিনি বাইরের ঘরে বসে যথারীতি ছেঁচা পান চিবোতে চিবোতে কবিতা কাটাকুটি করছেন।

নিখিলবাবু যখন মহেন্দ্র-ডাক্তারকে জানালেন যে, তিনি বল্লভপুরের শুভেচ্ছাবাণী নিতে এসেছেন, মহেন্দ্র-ডাক্তার হাতের ডায়েরির পাতাটা দেখিয়ে বললেন, "আপনাদের লেখাই লিখছি।"

একথা শুনে নিখিলবাবু একটু চিন্তান্বিত হলেন, এখনও কি লেখা শেষ হয়নি। তা হলে তো বিপদ, কালকের মধ্যে সব লেখা অবশ্যই কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে। এ-কথা মহেন্দ্র-ডাক্তারকে জানাতে তিনি

pathagar.net

বললেন, "কোনও অসুবিধে নেই, লেখা হয়ে গেছে, সংশোধন করছি, এখনই সংশোধন শেষ হয়ে যাবে।" এই বলে একটু থেমে তিনি ডায়েরি খুলে শুভেচ্ছাবাণীটা পড়ে শোনালেন নিখিলবাবুকে, বললেন, "দেখুন তো ঠিক হয়েছে কি না, নাকি আর-একটু বদলাতে হবে?"

সুর করে রামায়ণপাঠের মতো তাল মিলিয়ে ধীরে-ধীরে পড়ে চললেন মহেন্দ্র-ডাক্তার—

মোকাম বল্লভপুর অতি পুণ্যস্থান,
নিজ হাতে করেছেন তৈরি ভগবান।
সেই স্থানে দুর্গাপূজা হয় মজা ভারী,
পঞ্চাশ বছর পাড়ি দেয় বারোয়ারি।
পঞ্চাশ বছর নয় সামান্য সময়,
দাঁত পড়ে, চুল পাকে, শিশু বৃদ্ধ হয়।
পঞ্চাশ বছর আগে চুয়াল্লিশ সন,
ডাক্তার মহেন্দ্র পাল নবীন যৌবন।
নবীন বসন্ত দিন নবীন বয়স,
নাচে বক গাহে পিক কোকিল সারস।...

একই লাইনে পিক আর কোকিল লেখা ঠিক হল কি না এই সংশয়ে চিন্তান্বিত হয়ে এই পর্যন্ত পড়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার একবার নিখিল চক্রবর্তীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন, তারপর হঠাৎই জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম আপনার?"

নিখিলবাবু বললেন, "নিখিল চক্রবর্তী।"
মহেন্দ্র-ডাক্তার বললেন, "লেখাপড়া?"
নিখিলবাবু বললেন, "এম. এ. পড়ছি।"
মহেন্দ্র-ডাক্তার বললেন, "কোথায়?"
নিখিলবাবু বললেন, "কলকাতায়।"

কলকাতা শুনে মহেন্দ্র-ডাক্তার একটু আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ভাগলপুর কি সম্বলপুর, অথবা দ্বারভাঙ্গা,

pathagar.net

আজকাল কত জায়গায় সব শখের বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, হয়তো সে-রকমই কোথাও নিখিলবাবু এম এ পড়েন।

এবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে এবং আপনি থেকে তুমিতে নেমে মহেন্দ্র-ডাক্তার নিখিল চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বিষয় তোমার ?"

নিখিলবাবু বললেন, "ইংরেজি।"

একথা শুনে যে-কোনও সাবেকি লোকের মতোই মহেন্দ্র-ডাক্তার খুশি হলেন, মুখে বললেন, "বাঃ বেশ, বেশ, সাহিত্য খুব ভাল বিষয়। মনের পরিধি বাড়ে ; হৃদয় উদার হয়। তা আমার শুভেচ্ছাবাণী তোমার কেমন লাগল ? একালের হিজিবিজি পদ্য নয়, খাঁটি কৃত্তিবাসী পয়ারে লিখেছি।"

নিখিলবাবু এতক্ষণে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলেন, উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, "খুব ভাল, খুব চমৎকার হয়েছে। শুনলেই বোঝা যায় পাকা হাত আপনার।"

প্রশংসা শুনে মহেন্দ্র-ডাক্তার খুবই খুশি এবং পরিতৃপ্ত হলেন, বললেন, "খাসা সাহিত্যবোধ তোমার। এবার একটু বোসো, আমি পদ্যটা কপি করে দিই। একটু সংশোধন করতে হবে।"

নিখিলবাবু ভাবলেন বুড়ো মানুষ, কপি করতে গিয়ে আবার কতটা সংশোধন কতটা কাটাকুটি করবেন, কতক্ষণ দেরি করবেন, তার চেয়ে নিজেই তাড়াতাড়ি কপি করে নিই। তিনি ডায়েরির দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ডায়েরিটা আমাকে একটু দিন। আমি তাড়াতাড়ি কপি করে নিচ্ছি। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে আবার রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস হয়ে যেতে হবে।"

হঠাৎ রঘুনাথপুর দর্পণের কথা শুনে মহেন্দ্র-ডাক্তারের মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে চড়াত করে রক্ত উঠে গেল। তিরিশ বছর আগের অপমানের কথা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। সেই যে পদ্যে রঘুনাথপুর বৃত্তান্ত লিখেছিলেন, যেটা চেয়ে নিয়েও ওই যে কী নাম, অভয়পদ না অজয়পদ, না ছেপে ফেরত দিয়েছিল, সেই বেরসিক গজমূর্খ অভয়পদের কথাও মহেন্দ্র-ডাক্তার সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

প্রথম দিকে বিনে পয়সায় দু-এক সংখ্যা রঘুনাথপুর দর্পণ একটা ছেলে

এসে সাইকেলে করে দিয়ে যেত। যে-কয়েকবার দিয়ে যায় সে কয়েকবারই তিনি হয় রাউতারা বাজারে নিজের চেম্বারে রোগী দেখছিলেন অথবা রোগীর বাড়ি কলে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ বাড়ি ছিলেন না। বাড়ি ফিরে প্রত্যেকবারই রঘুনাথপুর দর্পণের কপি পেয়ে তিনি এক বিন্দুও না পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। দু-একবার আগুনেও জ্বালিয়ে দেন।

অবশেষে একবার রঘুনাথপুর দর্পণের সাইকেল-চালককে হাতেনাতে কাগজ দেবার সময় প্রায় ধরে ফেলেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে সাইকেল-চালক ছুটে পালাতে যায়। কিন্তু মহেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়ির ঠিক সামনে একটা উঁচু কালভার্ট আছে, সেটার ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যায় না, হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মাটি থেকে কালভার্ট প্রায় একফুট ওপরে। সেই কালভার্টের ওপর দিয়ে সাইকেল সহ দৌড়ে পালানোর সময় পিছন থেকে ছুটে গিয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার সাইকেলচালককে ধরে ফেলেন এবং সাইকেলসমেত তাকে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে কালভার্টের ওপর থেকে নীচে নয়ানজুলিতে ফেলে দেন। তখন পাঁচের ঘরে বয়েস পৌঁছে গেছে মহেন্দ্র-ডাক্তারের কিন্তু অসীম শক্তি তখনও তাঁর শরীরে, আর মনে অপরিসীম ক্রোধ।

এইখানে একটা প্রসঙ্গ একটু বলতে হচ্ছে। সেইদিন মহেন্দ্র-ডাক্তার সাইকেলসুদ্ধ যাঁকে কালভার্টের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তিনিই হলেন রঘুনাথপুর দর্পণের বর্তমান সম্পাদক গুরুপদবাবু।

গুরুপদবাবু তখন কলকাতায় পুলিশে কাজ করেন। ছুটিছাটায়, রবিবার-টবিবারে এসে তিনি জ্যাঠামশাইকে পত্রিকার কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন এবং ছুটিতে এলেই তিনি সাইকেলে করে আশেপাশের গ্রামের মধ্যে রঘুনাথপুর দর্পণ বিলি করতেন।

অবশ্য এই ঘটনার পর এইরকম দুঃসাহসিক কাজ করার তিনি আর বিশেষ ভরসা পাননি। রঘুনাথপুরে আসাই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কালক্রমে এই বিভীষিকাময় স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু আজ জয়ন্তলালের মুখে নিখিল চক্রবর্তীর রক্তগঙ্গা হওয়ার খবর শুনে তিরিশ বছর আগের সেই ভীতিবিদারক ঘটনা মনে পড়ে তাঁর হাত-পা-বুক

কাঁপতে লাগল। একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের দারোগার এতটা ভিতু হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কার্যকারণ ছাড়াই এই পৃথিবীতে কত কী হয়। অজানা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন গুরুপদবাবু। তাঁর গলা শুকিয়ে গেল, সামনের দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা মাটির কলসি, সেই কলসিটা উঁচু করে ঢকঢক করে অর্ধেক কলসি জল খেয়ে ফেললেন তিনি।

কথায়-কথায় তিরিশ বছর আগে চলে গিয়েছিলাম। নিখিলবাবু আর মহেন্দ্র-ডাক্তারের ব্যাপারটা আরও একটু বলা বাকি আছে।

নিখিলবাবু যখন রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসে যাওয়ার কথা মহেন্দ্র-ডাক্তারকে বলেছিলেন তখনই তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে যায়, তিনি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে নিখিলবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, "রঘুনাথপুর দর্পণ এখনও আছে?"

ভয়ে থমকে গিয়ে নিখিলবাবু জবাব দেন, "আজ্ঞে তা আছে।"

"অভয়পদ এখনও আছে?" মহেন্দ্র-ডাক্তার হুমকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

নিখিলবাবু অভয়পদর কথা কিছু জানেন না। তিনি হাল আমলের মানুষ, বর্তমান সম্পাদক গুরুপদবাবুকে চেনেন, তিনি মহেন্দ্র-ডাক্তারের প্রশ্নে একটু চিন্তা করে নিয়ে তারপর বললেন, "আপনি গুরুপদবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছেন? রঘুনাথপুর দর্পণ কাগজের সম্পাদক?"

বাচ্চা ছেলের মতো ঠোঁট উলটিয়ে, মুখ ভেংচিয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার বললেন, "রঘুনাথপুর দর্পণ আবার কাগজ! সেই কাগজের আবার সম্পাদক! তা অভয়পদ নাম পালটিয়ে গুরুপদ হয়েছে বুঝি। ফৌজদারি আদালত থেকে হুলিয়া বেরিয়েছিল বুঝি অভয়পদ নামে?"

মহেন্দ্র-ডাক্তারের এইসব কটূক্তি বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করতে পারছিলেন না নিখিলবাবু, পারার কথাও নয়। তিনি তো আর পুরনো কথা জানেন না।

সে যা হোক, নিখিল চক্রবর্তীর দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস হয়ে শুভেচ্ছাবাণী নিয়ে যেতে হবে রাউতারা

pathagar.net

বাজার, সেখান থেকে অন্তত গোটাদশেক বিজ্ঞাপন জোগাড় করতেই হবে। না হলে স্যুভেনিরের খরচ পোষাবে না। বিজ্ঞাপন জোগাড় করা শুভেচ্ছাবাণী জোগাড় করার চেয়েও ঢের-ঢের কঠিন কাজ। নানা অছিলায়, নানা অজুহাতে ব্যবসায়ীরা টালবাহানা করেন, বলেন, "সামনের সপ্তাহে আসুন।" "বিজ্ঞাপনের ব্লকটা এখনও ফেরত আসেনি।" "গোমস্তাবাবু বিজ্ঞাপনটা লিখে রাখবেন বলেছিলেন, তাঁর ছেলের অসুখ, তিন দিন দোকানে আসেননি।" সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার।

অথচ এখানেও ঝামেলা মোটেই কম হচ্ছে না। নিখিলবাবু এবার আরও তাড়াতাড়ি করতে গেলেন, মহেন্দ্রবাবুর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। "আর দেরি করবেন না। আমার হাতে আর সময় নেই। আপনার পরে রঘুনাথপুর দর্পণে গিয়ে গুরুপদবাবুর শুভেচ্ছা নিতে ধবে, তারপরে রাউতারা বাজারে...।"

বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারলেন না নিখিল চক্রবর্তী। তাঁর আগেই রঘুনাথপুর দর্পণের সম্পাদকের কাছ থেকেও শুভেচ্ছাবাণী নেওয়া হচ্ছে শুনে তিরিশ বছরের সুপ্ত সঞ্চিত অন্ধ ক্রোতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পান ছেঁচার হামানদিস্তার পাত্র থেকে লোহার ডাণ্ডাটি তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলেন নিরপরাধ নিখিল চক্রবর্তীর দিকে।

লাগবি তো লাগ সেই ডাণ্ডা গিয়ে লাগল নিখিলবাবুর মাথার চাঁদিতে। সঙ্গে-সঙ্গে 'আঁ-আঁ' করতে করতে তিনি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, তাঁর মাথার চুলের মধ্য দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে।

এত সহজে থমকে যাবার বা ঘাবড়ে যাবার পাত্র নন ডাক্তার মহেন্দ্র পাল। সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশকের ডাক্তারি জীবনে এবং তারও আগে আরও পাঁচ বছর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রজীবনে বহু রক্ত, বহু রক্তপাত দেখেছেন মহেন্দ্র-ডাক্তার।

তিনি নিখিল চক্রবর্তীর সংজ্ঞাহীনতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ভূপতিত নিখিলবাবুর কাঁধের নীচ থেকে হামানদিস্তার ডাণ্ডাটি উদ্ধার করে একটা বিশাল হুঙ্কার তুলে সেই ডাণ্ডাটি উত্তোলিত ডান হাতে নিয়ে নিজের বাড়ির সামনের প্রাচীন কালভার্টের ওপর দিয়ে ছুটে গেলেন।

দুঃখের বিষয়, এই তিরিশ বছরে রঘুনাথপুরসমেত সমস্ত পৃথিবীর

অনেক পরিবর্তন হয়েছে, শুধু সেই কালভার্ট, যার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে গুরুপদবাবু আহত এবং অপদস্থ হয়েছিলেন, সেই কালভার্ট এখনও জমি থেকে এক ফুট উঁচুতে রয়ে গেছে।

এই প্রাচীন বয়সে দৌড়ে মাটির ওপর থেকে এক ফুট উঁচু কালভার্টে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে একটা মারাত্মক হোঁচট খেয়ে শূন্যে ভয়াবহ একটা ডিগবাজির পর মহেন্দ্র-ডাক্তার কালভার্ট টপকে নীচে নয়ানজুলিতে পড়ে গেলেন।

এই সেই নয়ানজুলি, যেখানে তিরিশ বছর আগে রঘুনাথপুর দর্পণের সাইকেলচালক গুরুপদবাবুকে সাইকেলসুদ্ধু কালভার্টের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ক্রোধোন্মত্ত মহেন্দ্র-ডাক্তার। এতদিনে নিয়তি সেই ঘটনার পূর্ণ প্রতিশোধ নিল।

তবে সুখের কথা, এখন বর্ষা শেষে নয়ানজুলিতে টইটম্বুর জলের মধ্যে শ্যাওলা আর কলমিলতার ঘন দাম। কালভার্ট থেকে পড়ে গিয়ে একটুও চোট পেলেন না মহেন্দ্র-ডাক্তার, খুব ছোটবেলায় একটা বড় কাঠের আলমারির মাথা থেকে শোয়ার ঘরে বিছানার ওপরে ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়তেন মহেন্দ্র-ডাক্তার, খুব প্রিয় খেলা ছিল সেটা। তাঁর মা'র হাতে সেজন্যে অনেকবার নিগৃহীত হয়েছেন তিনি শিশু বয়েসে। আজ এতদিন পরে, অন্তত সত্তর বছর তো হলই, কালভার্ট থেকে কলমিদামের ওপর পড়ে গিয়ে সেই কথা মনে পড়ে গেল মহেন্দ্র-ডাক্তারের।

কিন্তু সে মাত্র এক বা দুই মুহূর্তের ব্যাপার। তিনি নয়ানজুলি থেকে অক্ষত অবস্থায় শ্যাওলা আর কলমিলতার জট ছাড়িয়ে ও-পাশে রাস্তার ধারে উঠে পড়লেন।

মহেন্দ্র-ডাক্তারের সারা গায়ে জল-কাদা, মাথায় শ্যাওলার স্তূপ, ঘাড়ে, গলায়, কোমরে কলমির লতা জড়ানো, হাতে উদ্যত হামানদিস্তার ডাণ্ডা, তিনি রুদ্ধশ্বাসে ছুটলেন রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসের দিকে।

এদিকে তাঁর বাইরের ঘরে তখন নিখিল চক্রবর্তীর আর্তনাদ শুনে চারদিক থেকে লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে ছুটে এসেছে। সবাই আহত এবং রক্তাপ্লুত নিখিলবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ খেয়ালই করল না যে, মহেন্দ্র-ডাক্তার ওই বেশে এবং ভীমমূর্তিতে রাস্তা

দিয়ে ছুটে চলেছেন।

বহুকাল মহেন্দ্র-ডাক্তার রোগী দেখেন না। বাড়ি থেকেও বেরোন না। আজকালকার রাস্তাঘাটের লোকজন তাঁকে মোটেই চেনে না। ভাদ্র মাসের গরমে প্রত্যেকবারই বহু লোক পাগল হয়ে যায়, তারা ভাবল সেই রকমই কোনও বুড়ো পাগল হয়ে ছুটছে।

জয়ন্তলাল তখন সাইকেল চালিয়ে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসে আসছিলেন। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে, তারপর কবিতা লিখতে গিয়ে সময় একেবারে খেয়াল ছিল না।

উদ্যত হামানদিস্তা হাতে মহেন্দ্র-ডাক্তারকে দেখে কিন্তু একেবারেই চিনে ফেললেন জয়ন্তলাল।

জয়ন্তলালের বয়স যখন দশ-এগারো বছর, তাঁর পিঠে একটা পঞ্চমুখী ফোড়া হয়েছিল, ডাক্তারি ভাষায় তার নাম নাকি কারবঙ্কল। বিশাল ফোড়া সেটা, পিঠের অর্ধেক জুড়ে উঠেছিল। জয়ন্তলালের পিঠের সেই ফোড়া মহেন্দ্র-ডাক্তার স্পিরিট ল্যাম্পে ছুরি গরম করে কেটেছিলেন।

মহেন্দ্র-ডাক্তারের চিকিৎসক জীবনের একেবারে শেষ দিকের ঘটনা এটা, এর পরে বোধ হয় আর মাত্র দু-চার বছর প্র্যাকটিস করেছিলেন তিনি। সে যা হোক, জয়ন্তলাল কিন্তু মহেন্দ্র-ডাক্তারকে দেখে এক পলকেই চিনতে পেরেছিলেন। তার কারণ আর কিছু নয় হাতের উদ্যত হামানদিস্তা।

অনেকদিন আগে তাঁর ফোড়াকাটার সময় ঠিক ওই ভঙ্গিতেই ছুরি ধরেছিলেন মহেন্দ্র-ডাক্তার। আতঙ্কিত শিশুমনে সেই ভঙ্গির যে স্থায়ী ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেটা মহেন্দ্র-ডাক্তারকে দেখে মনে পড়ে গেল।

জয়ন্তলাল জানেন মহেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়ি সামনেই। সেখানে তখন নিখিল চক্রবর্তীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা রিকশায় তোলা হচ্ছিল। তাঁর একটু জ্ঞান ফিরে এসেছিল, তিনি জয়ন্তলালকে চেনেন, একই স্কুলে চার ক্লাস নীচে পড়তেন এবং নিখিলবাবু এটাও জানেন যে জয়ন্তলাল এখন রঘুনাথপুর দর্পণে কাজ করেন।

নিখিলবাবু জয়ন্তলালকে দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্তদা,

পালান। মহেন্দ্র-ডাক্তার হামানদিস্তার ডাণ্ডা নিয়ে আপনাদের রঘুনাথপুর দর্পণ আক্রমণ করতে গেছে।”

আবার হাসি ফুটিয়া উঠুক

মহেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়ি থেকে গুরুপদবাবুর বাড়ি মানে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসে যাওয়ার একটা শর্টকাট আছে। সামনের ফুটবল খেলার মাঠের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি চলে গেছে এসটা সরু পায়ে চলা পথ। সে-পথে সাইকেলও চালানো যায়। তবে এই বর্ষার শেষে সে-পথে সামান্য জল-কাদা আছে।

তা থাকুক। নিখিলবাবুর মুখ থেকে মহেন্দ্র-ডাক্তার রঘুনাথপুর দর্পণ অফিস আক্রমণ করতে গেছেন শুনে এবং তার আগে রাস্তায় মারমুখী মহেন্দ্র-ডাক্তারকে ছুটে যেতে দেখে সাঁই-সাঁই করে সেই মাঠের মধ্যে জল-কাদার রাস্তার শর্টকাট ধরে জয়ন্তলাল গুরুপদবাবুর কাছে এসে পৌঁছলেন এবং এই ভয়াবহ খবর দিলেন।

মহেন্দ্র-ডাক্তার যদি রাস্তায় থেমে না গিয়ে থাকেন তবে আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন।

বহুকাল আগে সেই যে মহেন্দ্র-ডাক্তারের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও গুরুপদবাবুর মনে আছে। সেই ভাঙা সাইকেলটা ছাপাখানা ঘরের পিছনে পুরনো জঞ্জালের মধ্যে আজও আছে। আজও প্রতি একাদশী, পূর্ণিমায় গুরুপদবাবুর ডান হাঁটুটা ফুলে যায়, ব্যথা করে। সেই কালভার্ট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার আঘাত আজও তাঁর শরীরে রয়েছে। একটা কাটা চিহ্নও রয়ে গেছে কপালের মাঝখানে।

এ-কথা ঠিক, অনেকদিন পুলিশের চাকরি করেছেন গুরুপদবাবু, চাকরির খাতিরে অনেক বিপজ্জনক, ভয়ানক সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেকবার। সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় বুদ্ধি, বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

pathagar.net

একবার একটা হনুমান পুলিশ আদালতের মধ্যে ঢুকে একেবারে হাকিমের এজলাসে গিয়ে উপস্থিত হয়। হাকিম-সাহেব, উকিল, আসামি, সাক্ষীরা সবাই হকচকিয়ে যায়। সবাই ভয় পেয়েছে দেখে আসামির কাঠগড়ার ওপরে বসে হাকিম-সাহেব সমেত ঘরের প্রত্যেককে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।

সেদিন ওই আদালত কক্ষে একটি ফৌজদারি মামলা উপলক্ষে গুরুপদবাবু উপস্থিত ছিলেন। শুধু তিনি, একমাত্র তিনিই মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন এবং উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ওই হনুমানের হাত থেকে আদালতকে রক্ষা করেন এবং আদালতের সম্মান পুনরুদ্ধার করেন।

গুরুপদবাবুর সামনেই ছিলেন আসামির পক্ষের প্রবীণ উকিল। তাঁর কাঁধে ছিল পুরনো আমলের ভারী, কালো রেশমের শামলা যাকে বলে উকিলের গাউন। গুরুপদবাবু অতর্কিতে ওই উকিলবাবুর কাঁধ থেকে কালো শামলাটা তুলে নিয়ে হনুমানটার ওপরে ছুঁড়ে দেন।

অকস্মাৎ ওই রকম একটা বিদ্‌ঘুটে জিনিসের নীচে চাপা পড়ায় হনুমানটা কিছুই বুঝতে না পেরে আদালত কক্ষের মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে শামলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায়।

সে এই চেষ্টা যত বেশি বাড়াতে থাকে, ততই প্রবীণ উকিলবাবু চেঁচাতে থাকেন, "আমার সর্বনাশ হল, আমার দাদাশ্বশুর রায়-সাহেব পঞ্চানন সেনের শামলা এটা। পুলিশের আহাম্মকিতে হনুমান ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে। হুজুর, ধর্মাবতার..."

হুজুর, ধর্মাবতার মানে হাকিম-সাহেবের তখন আর কিছু করার ছিল না। এবং এটাও তারিফ করছিলেন যে, পুরনো আমলের শামলার কাপড়ের বুনোট কত শক্ত ও নিরেট, একটা বদমায়েশ হনুমান চেষ্টা করেও ছিঁড়ে বেরোতে পারছে না। রায়-সাহেব পঞ্চানন সেনের দৌহিত্রী-জামাতার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনার গর্বিত হওয়া উচিত। আপনি রায়-সাহেব পঞ্চানন সেনের গ্র্যান্ড সন ইন ল। রায়-সাহেবের জন্যে, রায়-সহেবের ওই শক্ত শামলার জন্যে, আপনি শুধু আপনি কেন, আমরা সবাই অল অব আস শুড ফিল প্রাউড।"

pathagar.net

সেদিনের হনুমানপর্ব এর পরে আর বিশেষ গড়ায়নি। অনেকক্ষণ লড়াই করার পর হনুমানপ্রবর ক্লান্তও নির্জীব হয়ে পড়ে। তারপরে দমকলের লোকেরা এসে তাকে শামলাসমেত চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে সেই শামলাপরা হনুমান নাকি জীবজন্তুদের উকিল হয়েছে। তাদের অভাব-অভিযোগ, বাদ-বিসম্বাদ সেই এখন তদ্বির-তদারক সমাধান করে।

এসব অন্য কথা। আসল কথা হল, এই ঘটনার পরে গুরুপদবাবুর সাহসের খ্যাতি পুলিশ আদালতে এবং সেই সূত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

তখন গুরুপদবাবু সবে সহকারী দারোগা বা এ. এস. আই. হয়েছেন।

বড়সাহেব তাঁকে ডেকে বললেন, "গুরুপদ, ফোর্ট উইলিয়ামে বড় হনুমানের উৎপাত হয়েছে। মেজর জেনারেল কোথা থেকে তোমার নাম পেয়েছেন। তুমি মাস-ছয়েক ওঁদের ওখানে গিয়ে হনুমানগুলোকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসো।"

আরও একবার। সেটা ছিল বুদ্ধির ব্যাপার।

গুরুপদবাবু তখন দর্জিপাড়া থানায় ছোট-দারোগা। বড়-দারোগা ছুটিতে গেছেন, গুরুপদবাবুকেই থানার সব-কিছুর দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

সেবার একটা ভয়ানক কাণ্ড হল দর্জিপাড়ায়। দর্জিপাড়া থানা এলাকার একটা বহু পরিচিত কুখ্যাত চোর হঠাৎ কী-কারণে পাগল হয়ে গেল।

চোরেদের পাগল হওয়ার নিয়ম নেই। তাদের চুপিসাড়ে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের কাজ সারতে হয়। পাগলামি করলে তাদের সর্বনাশ।

কিন্তু এ চোরটা, যতদূর মনে পড়েছে, চোরটার নাম ছিল ল্যাঠালাল, পাগল হয়ে নানা ঝামেলা পাকিয়ে তুলল। কোথায় গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে চুরির কাজ হাসিল করে গোপনে চলে আসবে তা নয়, ল্যাঠালাল চুরি করে আসার সময় গৃহস্থের জানলায় উঁকি মেরে বলে আসত, "সব নিয়ে গেলাম। নে, আরও ঘুমো।"

একে জিনিস চুরির শোক, তার সঙ্গে চোরের মুখে এ-ধরনের কটূক্তি, পুরো দর্জিপাড়ার লোকেরা খেপে গেল। দু-একটা ক্ষেত্রে ল্যাঠালাল

pathagar.net

এমন দুঃসাহস দেখাল যে, চুরি করার পরের দিন রাতে বলে এল, "গিলটি করা গয়না লোহার আলমারিতে রাখো কেন," কিংবা "হাতবাক্সে ছিল মাত্র আঠারো টাকা বারো আনা আর থানায় ডায়েরি করেছ দেড় হাজার টাকা চুরি গেছে বলে, জোচ্চোর কোথাকার।"

এত সব সত্ত্বেও, যদিও সবাই জানত যে, ল্যাঠালালই চোর, তোকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছিল না। তখন বুদ্ধি করে গুরুপদবাবু সে-পাড়ায় রটিয়ে দিলেন যে, ল্যাঠালাল থানার দারোগা গুরুপদবাবুর বাড়িতেও চুরি করেছে। ল্যাঠালাল ফাঁদে পা দিল, পরের দিন রাত্রেই থানার পিছনের পাইপ বেয়ে গুরুপদবাবুর দোতলার কোয়ার্টারের জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে 'মিথ্যুক দারোগা' বলে তিনবার টিটকিরি দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে সে যখন পালাতে যাচ্ছে গুরুপদবাবু তাকে ধরে ফেললেন, কারণ গুরুপদবাবু কোয়ার্টারে তাঁর ঘরের মধ্যে ছিলেন না। পাইপের নীচে ল্যাঠালালের জন্য ওত পেতে বসে ছিলেন।

এসব পুরনো কথায় এখন আর কাজ নেই। তা ছাড়া বুদ্ধির সুযোগ নেই আজকের বিপদ অনেক বেশি গুরুতর। হাতে মাত্র কয়েক মিনিট সময়, মহেন্দ্র-ডাক্তার যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন। যা সিদ্ধান্ত নিতে হয়, এই মুহূর্তেই নিতে হবে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, জয়ন্তলাল এবং গুরুপদবাবু দুজনে মিলে মহেন্দ্র-ডাক্তার হামানদিস্তার ডাণ্ডা ছোঁড়ার আগেই যদি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন তা হলে হয়তো একটু ধস্তাধস্তি বা সামান্য হাতাহাতি হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ মহেন্দ্র-ডাক্তারকে ঠেকানো খুব কঠিন হবে না। তবে বেশি ধস্তাধস্তি করতে গেলে পরিণাম বিপজ্জনক হতে পারে, গুরুপদবাবু পুরনো হার্টের রোগী, নিয়মিত ওষুধের ওপরে আছেন। এ-ধরনের ধস্তাধস্তি তো দূরের কথা, কোনওরকমের উত্তেজনা ডাক্তারের সম্পূর্ণ বারণ। ওদিকে মহেন্দ্র-ডাক্তারও অতি বৃদ্ধ, এরকম খণ্ডযুদ্ধে তিনিও হার্ট ফেল করতে পারেন, কিছুই আশ্চর্য নয়।

মহেন্দ্র-ডাক্তার অক্কা পেলে গুরুপদবাবু খুশিই হন। আজ তিরিশ বছর ধরে মহেন্দ্র-ডাক্তারের ভয় তাঁর মনের মধ্যে ছমছম করছে। দিন-দিন সেটা, সেই ভয়টা বেড়েছে বই কমেনি। ভয়টা মনের মধ্যে

pathagar.net

থেকে বহুবার গুরুপদবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারেননি।

সে যা হোক, এখন তো জয়ন্তলালের মুখে মহেন্দ্র-ডাক্তারের হিংস্র অভিযানের খবর শুনে হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। আর সময় নেই, যা করতে হয় এই মুহূর্তেই করতে হবে।

অবশ্য সবচেয়ে সহজ সমাধান হল, পালিয়ে যাওয়া অথবা সরাসরি মহেন্দ্র-ডাক্তারের মুখোমুখি হওয়া, এতে যা হয় হবে। পালানো ব্যাপারটা খুবই কাপুরুষতা হবে, একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের পক্ষে সেটা মোটেই সম্মানজনক নয়। অথচ এইরকম বিপদের মুখোমুখি হতেও মন সায় দিচ্ছে না।

কোনওরকম কথাবার্তা না বলে পরস্পরের মুখের দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন গুরুপদবাবু আর জয়ন্তলাল।

ঠিক এই মুহূর্তেই বাইরে রাস্তার দিকে প্রচণ্ড দুদ্দাড়, ধুরধার শব্দ ও হইচই শোনা গেল।

চমকে উঠে গুরুপদবাবু এক দৌড়ে রঘুনাথপুর দর্পণের ছাপাখানা ঘরে ঢুকে ছাপার মেশিনের পিছনে লুকিয়ে পড়লেন। শুধু লুকনোর আগে জয়ন্তলালকে বলে গেলেন, "সাইকেলটা সাবধান। ডাক্তার কিন্তু সাইকেলটা ভেঙে ফেলবে।"

এর পরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এক বৃদ্ধ আর এক প্রৌঢ় গজকচ্ছপের মতো লড়ালড়ি করতে-করতে একেবারে জড়াজড়ি করে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিস ঘরের সামনে এসে পড়লেন।

তখন গুরুপদবাবুর পরামর্শমতো ঘরের পিছন দিকে সাইকেলটা লুকোচ্ছিলেন জয়ন্তলাল। ওখানে কয়েকটা মানকচু গাছ আছে, রীতিমত একটা ঝোপ, তার আড়ালে সাইকেলটাকে রেখে বাইরে এসে দ্যাখেন, রীতিমত ধুন্ধুমার কাণ্ড।

কালিয়াপুরের প্রৌঢ় পোস্টমাস্টার রণধীর দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বৃদ্ধ মহেন্দ্র-ডাক্তারের জাপটাজাপটি চলছে। সুখের কথা, মহেন্দ্র-ডাক্তারের হাতে হামানদিস্তার ডাণ্ডাটা নেই। তিনি চেষ্টা করছেন একতাড়া কাগজ ছিনিয়ে নিতে, আর রণধীরবাবু সেই কাগজগুলো বাঁচানোর জন্যে প্রাণপণ

BanglaBook.org

লড়ে যাচ্ছেন।

রাস্তায় বেশ ভিড় হয়েছে। দু-চারজন মজা দেখছে, আবার দু-চারজন আন্তরিক চেষ্টা করছে এই দুই প্রবীণের আশ্চর্য লড়াই থামাতে।

মহেন্দ্র-ডাক্তার আজকাল বয়সের জন্যই চোখে খুব কম দ্যাখেন। তা ছাড়া তিনি অভয়পদবাবুকে মানে গুরুপদবাবুর জ্যাঠামশাই রঘুনাথপুর দর্পণের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদককে শেষ দেখছেন তিরিশ বছর আগে।

রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসের সামনে হাতে একতাড়া কাগজপত্র দেখে প্রবীণ পোস্টমাস্টার-মশাইকে তিনি মনে করেছেন অভয়পদবাবু। অভয়পদবাবু যে বেঁচে নেই সেটা পর্যন্ত তিনি জানেন না। অভয়পদবাবু বেঁচে থাকলে এখন যে তাঁর নব্বইয়ের কোঠায় বয়স হত সে হিসেবও রাখেননি মহেন্দ্র-ডাক্তার।

কবে অভয়পদবাবু তাঁর কবিতা ফেরত দিয়েছিলেন, ছাপবেন বলে চেয়ে নিয়ে, সেই রাগ তিনি এতকাল ধরে পুষছেন। চোখে চশমা, ময়লা পাঞ্জাবি-পরা, ঢ্যাঙা রণধীর পোস্টমাস্টার-মশাইয়ের চেহারার সঙ্গে সামান্য আদল হয়তো থাকতে পারে পরলোকগত সম্পাদক অভয়পদবাবুর সঙ্গে।

রণধীরবাবু সম্প্রতি ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাবু হয়ে দিনসাতেক বিছানায় পড়েছিলেন। কালকেই অন্নপথ্য করেছেন। অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু'দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজে একগাদা কবিতা লিখেছেন তিনি। সেইসব কবিতা নিয়ে আজ আপনমনে রঘুনাথপুর দর্পণ অফিসে গুরুপদবাবুর কাছে, বিশেষ করে জয়ন্তলালকে কবিতাগুলো দেখাতে এবং শোনাতে নিয়ে আসছিলেন তিনি।

হঠাৎ পথের মধ্যে এ কী বিপদ।

কিছু বোঝার আগে বা টের পাওয়ার আগে, তাঁর কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে কী-একটা ভারী জিনিস উল্কার মত ছুটে গেল। ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেলেন, হঠাৎ মাথায় বা কপালে লাগলে হয়েছিল আর কি!

ওই ভারী জিনিসটা আর কিছুই নয়, হামানদিস্তার ডাণ্ডা, যা দিয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার অল্প আগে নিখিল চক্রবর্তীকে ভূপতিত করেছিলেন।

সুখের কথা, এবারে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।

আখের গুড়

রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে আসতে চলন্ত অবস্থাতেই হামানদিস্তার ডাণ্ডাটা কাল্পনিক অভয়পদবাবু অর্থাৎ বর্তমান রণধীরবাবুর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারেন মহেন্দ্র-ডাক্তার এবং ওই হামানদিস্তার ডাণ্ডাটা যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, ছিটকে গিয়ে অনেক দূরে একটা রাস্তার পাশের ড্রেনের মধ্যে পড়ে, তখন সেটাকে উদ্ধার করার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা সময় নষ্ট না করে একটা হুঙ্কার তুলে বীরবিক্রমে মহেন্দ্র-ডাক্তার রণধীরবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না রণধীরবাবু, প্রস্তুত থাকার কথাও নয়। এ-ধরনের অঘটনের কথা কে আর ভাবতে পারে।

সেই মুহূর্তে রণধীরবাবু ভাবছিলেন চারদিন আগে লেখা একটা কবিতার কথা। ভাদ্র মাসের দুপুরের তালপাকানো গরমে টিনের চালার নীচে ঘরে বিছানায়। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে একশো চার ডিগ্রি জ্বরের মধ্যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন। ঠিক কবিতা বলা যায় না, ছড়ার মতো ছন্দ আছে একটা—

বাংলার ঘর ঘর
জ্বরে জ্বরে জর্জর
কালাজ্বর পালাজ্বর
ডেঙ্গু ও পিলে জ্বর
ম্যালেরিয়া থরথর
জ্বরে জ্বরে মরমর।

পদ্যটা লিখে অত জ্বরের মধ্যেও মনের ভিতরে একটা আনন্দ হয়েছিল রণধীরবাবুর। জ্বরের কাঁপুনিটা বেশ কায়দা করে ছন্দের মধ্যে ঢোকানো গেছে।

pathagar.net

এইসব ভাবতে-ভাবতে আপন মনে হেঁটে আসছিলেন রণধীর পোস্টমাস্টার-মশাই। হঠাৎ এই বিপত্তি।

তিনি বাইরের লোক। আজ কয়েক বছর হল, এখানে পোস্টমাস্টার হিসেবে বদলি হয়ে এসেছেন, মহেন্দ্র-ডাক্তারকে মোটেই চেনেন না। এখন যখন মহেন্দ্র-ডাক্তার তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর হাত থেকে কাগজের তাড়া ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, রণধীরবাবুও যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগলেন মহেন্দ্র-ডাক্তারকে, কেন কী হচ্ছে কিছুই না বুঝে।

একজন অতি বৃদ্ধ, অন্যজন সদ্য অন্নপথ্য করে ওঠা রোগী। দুজনেই সমান-সমান। সমান দুর্বল।

কিন্তু তাঁদের দুজনকে ছাড়াতে রাস্তার লোকেরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত দুজনকে বহু কষ্টে পরস্পরের কঠোর আলিঙ্গন এবং বজ্রবাহুর বেষ্টনী থেকে ছাড়ানো সম্ভব হল। দুজনেই গায়ের ধুলো ঝেড়ে রাস্তায় বসে হাঁফাতে লাগলেন। রণধীরবাবুর হাতের কবিতার তাড়া রাস্তার অন্য দিকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। জয়ন্তলাল ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে তুলে আনলেন সেটা।

একটু পরে মহেন্দ্র-ডাক্তারের যখন হৃদয়ঙ্গম হল যে, তিনি যাঁকে আক্রমণ করেছেন সেই ব্যক্তি অভয়পদবাবু নন। বৃদ্ধ রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বারবার করজোড়ে রণধীরবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

রণধীরবাবুও মহানুভব ব্যক্তি। মুহূর্তের মধ্যে মহেন্দ্র-ডাক্তারকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং যখন জানলেন যে, তিনি ডাক্তার, সঙ্গে-সঙ্গে জয়ন্তলালের কাছ থেকে কাগজগুলো নিয়ে পাতা খুলে তাঁকে জ্বরের ওপর লেখা কবিতাটা শোনাতে লাগলেন।

জয়ন্তলাল রণধীরবাবুকে কাগজের তাড়াটা দিতে যখন এগিয়ে এসেছেন, মহেন্দ্র-ডাক্তার খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জয়ন্তলালকে দেখলেন, যদিও চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে তাঁর, তবু এই দৃষ্টি উন্মাদ কবির এলোমেলো চাউনি নয়, পাকা ডাক্তারের সূক্ষ্ম দেখা।

মুখের আদলটা ভাল করে দেখে নিয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার বললেন,

pathagar.net

"তোমার পিঠে কার্বাঙ্কল হয়েছিল না ?"

সেই কবেকার কথা। মহেন্দ্র-ডাক্তারের স্মৃতিশক্তি দেখে বিস্মিত হলেন জয়ন্তলাল, বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

মহেন্দ্র-ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, "জামাটা খোলো তো।" এতগুলো লোকের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় জামাটা খুলতে জয়ন্তলাল ইতস্তত করছিলেন। মহেন্দ্র-ডাক্তার ধমকে উঠলেন, "দেরি করছ কেন ? দেখি, পিঠটা দেখি।"

বাধ্য হয়ে জয়ন্তলাল গায়ের জামাটা খুলে মহেন্দ্র-ডাক্তারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। খুব যত্ন নিয়ে পিঠটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করলেন। অতদিন আগের ফোড়ার দাগ এখন প্রায় সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। পিঠটা দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন মহেন্দ্র-ডাক্তার, বললেন, "কাটার দাগটা চমৎকার মিলিয়ে গেছে।" এরপর জয়ন্তলাল জামাটা আবার গায়ে দিতে সামনের ঘরের দেওয়ালে রঘুনাথপুর দর্পণের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্র-ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কী করছ ?"

জয়ন্তলাল বললেন, "আজ্ঞে, আমি এখানে চাকরি করি।'

মহেন্দ্র-ডাক্তারের দৃষ্টি ক্রূর হয়ে উঠল, কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "অভয়পদর কাছে কাজ করো ?"

রণধীরবাবু পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, জয়ন্তলাল বলার আগেই তিনি বললেন, "অভয়পদবাবু আগে ছিলেন, এখন তো তিনি বেঁচে নেই।"

অভয়পদবাবু বেঁচে নেই শুনে মহেন্দ্র-ডাক্তার ভীষণ চুপসে গেলেন। তা হলে কার বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্রোধ, এই সংগ্রাম ?

ইতিমধ্যে বাইরের গোলমাল স্তিমিত হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে ধীরে-ধীরে ছাপাখানার মেশিনের পেছনের ঘুপচি থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন গুরুপদবাবু।

গুরুপদবাবুর চেহারা মোটেই অভয়পদবাবুর মতো নয়। তাঁর মাথায় টাক, যা মোটেই অভয়পদবাবুর ছিল না। তা ছাড়া, তিনি মোটেই লম্বা নন। তাঁকে দেখে অভয়পদবাবুর ভাইপো বলে মনে হয় না।

সুতরাং, গুরুপদবাবু যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে

pathagar.net

জয়ন্তলাল মহেন্দ্র-ডাক্তারের পরিচয় করিয়ে দিলেন বর্তমান সম্পাদক হিসেবে, মহেন্দ্র-ডাক্তারের মনে কোনও রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

তিরিশ বছর আগের সেই মার খাওয়ার এবং আজকের সকালের ঘটনা মনে রেখেও এখন মহেন্দ্র-ডাক্তারকে দেখে গুরুপদবাবুর আর তেমন ভয় করছে না। বেশ শান্তই তো মনে হচ্ছে।

গুরুপদবাবু হাতজোড় করে মহেন্দ্র-ডাক্তারকে বললেন, "আপনি প্রবীণ মানুষ, শুনেছি সারাদিন কবিতা লেখেন। আমাদের দু-একটা লেখা দেবেন।"

গুরুপদবাবুর এই আমন্ত্রণ শুনে মহেন্দ্র-ডাক্তার যেমন উল্লসিত হলেন, তেমনই প্রমাদ গুনলেন জয়ন্তলাল। এই বুড়ো-ডাক্তারের কবিতা ছাপতে হলে সর্বনাশ।

মহেন্দ্র-ডাক্তারের কিন্তু পুরনো অভিমান নিয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন না, বললেন, "আমি সন্ধেবেলাতেই এসে কয়েকটা কবিতা দিয়ে যাব। একটা পুরনো কবিতা আছে, 'রঘুনাথপুর বৃত্তান্ত', খাঁটি কৃত্তিবাসী পয়ারে লেখা। আগের সম্পাদক ফেরত দিয়েছিল, পড়ে দেখবেন, লোকটা কেমন আহাম্মক ছিল।" এই বলে রণধীরবাবুর হাত ধরে টানলেন, বললেন, "চলুন, আমার বাসায়। আপনাকে কবিতাটা শোনাই।"

রণধীরবাবু নিজের হাতের কবিতার গাদা দেখিয়ে বললেন, "আমার কবিতাগুলোও শুনতে হবে। আমি জ্বরের ওপরে কবিতা লিখেছি। নিমুনিয়া, টাইফয়েড এমনকী যক্ষ্মার ওপরে কবিতা লিখেছি। ক্যানসারের ওপরে ইংরেজিতে পদ্য লিখেছি, ক্যানসার-ক্যানসার, হোয়্যার ইজ অ্যানসার, আপনাকে সব শোনাব।"

মহেন্দ্র-ডাক্তারকে মোটেই বিচলিত দেখাল না এই প্রস্তাবে, কারণ তাঁরও হাতে শোনানোর মতো অজস্র কবিতা। ডাক্তার আর পোস্টমাস্টার-মশাই হাত ধরাধরি করে চলে গেলেন। ওঁদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গুরুপদবাবু জয়ন্তলালকে বললেন, "যে যা দেয় অল্পস্বল্প ঠিকঠাক করে ছাপালেই হবে। আর গোলমালের মধ্যে গিয়ে

pathagar.net

কাজ নেই।"

গোলমালের কথায় জয়ন্তলালের নিখিলের কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি কুচুঝোপ থেকে সাইকেলটা বার করে এনে তাতে চেপে বসে বললেন, "যাই, এনামেল হাসপাতালে গিয়ে নিখিলকে দেখে আসি। ছোকরা কেমন আছে, কে জানে?"

হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হল না। একটু এগোতেই দেখা গেল উলটো দিক থেকে রিকশ করে নিখিল আসছেন। তাঁর হাতে দু' টুকরো কাগজ। একটা কাগজ দেখিয়ে নিখিল বললেন, "এটা মহেন্দ্র-ডাক্তারের শুভেচ্ছাবাণী। লোকটা একদম ভাল হয়ে গেছে। অন্য একটা বুড়োর সঙ্গে বসে কবিতা পড়ছে। আমি যেতেই এই কবিতাটা দিয়ে দিল।"

তারপর দ্বিতীয় কাগজটা দেখিয়ে নিখিল বললেন, "আর, এটা ওঁর প্রেসক্রিপশন। অনেককাল পরে আমিই ওঁর আবার প্রথম রোগী। উনিই মারলেন আবার উনিই চিকিৎসা করলেন। বললেন, কিছু হয়নি। দুটো বাথার ট্যাবলেট খেলেই হয়ে যাবে।"

জয়ন্তলালের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল এবার ব্যাখ্যা দিলেন, "হাসপাতালেও তাই বলেছিল। আমার মাথা খুব নিরেট। হামানদিস্তার ডাণ্ডায় কিছু করতে পারেনি, শুধু একটু ফুলে গিয়েছে। আমি মহেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়িতে গিয়েছিলাম সাইকেলটা উদ্ধার করতে। তিনি তখন ওই শুভেচ্ছাবাণী আর প্রেসক্রিপশন দিলেন। আর বললেন, আজকে সাইকেল চালানো ঠিক হবে না। উনি পরে লোক দিয়ে বল্লভপুরে আমার বাড়িতে সাইকেলটা পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা রেখে দিয়েছেন।"

নিজের সাইকেল থেকে নেমে রিকশর একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন জয়ন্তলাল। তাঁর কী একটা মনে পড়ল, তিনি বললেন, "কিন্তু তোমার চুলের মধ্যে রক্তের দাগ দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল মাথা ফেটে গেছে।"

"হাসপাতালের লোকেরাও তাই ভেবেছিল," নিখিলবাবু হেসে বললেন, "কিন্তু পরে দেখা গেল হামানদিস্তার ডাণ্ডার সঙ্গে থ্যাঁতলানো পানের লাল রং লেগেছিল। মাথার চুলে সেটা লেগে রক্তের মতো

pathagar.net

দেখাচ্ছিল।"

বেশ আশ্বস্ত দেখাচ্ছিল নিখিলবাবুকে। কিছুক্ষণ আগেই যে তাঁর ওপর দিয়ে অতবড় ঝড় বয়ে গেছে তাঁকে দেখে এখন আর সেটা বোঝার উপায় নেই।

নিখিল চক্রবর্তী জয়ন্তলালকে বললেন, "চলুন, আপনাদের ওখানে যাই। গুরুপদবাবুর কাছ থেকে শুভেচ্ছাবাণীটা নিতে হবে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে লেখা হয়ে গেছে ওঁর।"

জয়ন্তলালের সঙ্গে রঘুনাথপুর দর্পণের অফিসে যেতেই সদ্য-রচিত শুভেচ্ছাবাণীটি গুরুপদবাবু নিখিল চক্রবর্তীকে দিয়ে দিলেন। অবশ্য দেওয়ার আগে দুজনকে সেটা পড়ে শোনাতে ভুল করলেন না।

"শুভ্র গোলাপের মতো ছোট-ছোট খোকাখুকু-ভাইবোনদের মুখে আবার আগের মতো হাসি ফুটিয়া উঠুক," এই শেষ পঙ্‌ক্তিটা পড়তে গিয়ে তাঁর গলা আবেগে ধরে এল।

পড়া শেষ করে প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সময় গুরুপদবাবু নিজের রচনার আবেগে অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটু ঢোক গিলে জয়ন্তলাল আর-একবার নিখিলবাবুর দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বললেন, "এই শেষের লাইনটা খুব চমৎকার, খুব মানানসই হয়েছে, তাই না? ওই যে ওই শুভ্র গোলাপের মতো খোকাখুকুর জায়গাটা?"

বেলা বাড়ছে। ভাদ্রশেষের রোদে চারদিক চনমন করে উঠছে। দূরে কোথায় ঢাক বাজছে, পুজো এসে গেল। আবার একঝাঁক টিয়াপাখি কোথা থেকে কিচমিচ করতে করতে উড়ে এসে সামনের আমবাগানে ঢুকে গেল। কালাচাঁদ কুকুরটা এতক্ষণ দাওয়ার কাছে রোদে শুয়ে ছিল, এখন তাপ বেড়ে যাওয়ার গুটি গুটি উঠে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

গুরুপদবাবুর শুভেচ্ছাবাণী নিয়ে নিখিলবাবু রিকশয় করে চলে গেলেন। মোড়ের মাথায় বাসস্টপ থেকে বাসে উঠে বল্লভপুর চলে যাবেন। বিকেলে জয়ন্তলালকে একবার খোঁজ নিতে হবে বুড়ো-ডাক্তার সাইকেলটা বল্লভপুরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছেন কি না। তাতেও বিপদ আছে, গেলে পরেই হয়তো কবিতা ধরিয়ে দেবেন।

তা দিন। গুরুপদবাবু যেমন বলেছেন, এসব নিয়ে বেশি গোলমাল করে লাভ নেই। সবাইয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। একটু-একটু কাট-ছাঁট করে কম-বেশি যেটুকু পারা যায় সকলের লেখাই দিতে হবে।

আসলে ওসব লেখা তো লেখা নয়। ছাপাখানার অফিসঘরে ঢুকে গিয়ে রঘুনাথপুর দর্পণের আগামী সংখ্যার প্রুফ দেখতে দেখতে জয়ন্তলাল ভাবতে লাগলেন, 'এখন থেকে আসল লেখা লিখতে হবে আমাকে। ওই যে কাল রাতে লিখেছিলাম—আখের গুড়ে শালুক ডাঁটা গরম ভাত রাঙাবরণ—ওই রকম লেখা অনেক, অনেক লিখতে হবে।'

pathagar.net

হরেরাম

[এক]

আশ্চর্য ফল

বয়েস হয়েছে হরগোবিন্দবাবুর। তা প্রায় একাত্তর, বাহাত্তর হবে। দক্ষিণ কলকাতায় হরিশ মুখার্জি রোডের পাশে একটা ছোট গলিতে পৈতৃক বাড়ি, দোতলায় থাকেন। নীচের তলায় দু-চারঘর ভাড়াটে আছে, একটা দোকানঘর ; ভালভাবেই সংসার চলে যায় তাঁর। তিন মেয়ে ছিল, যথাসময়ে তাদের বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে স্ত্রী সত্যভামা আর পুরনো কাজের লোক হাবুলের মা। অনেকদিন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করেছিলেন, এখন আর করেন না। একতলার চেম্বার দোকানঘর হিসেবে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। তবে সেই ডাক্তারির সুবাদে এখনও বহু লোক তাঁকে হরডাক্তার বা ডাক্তারবাবু বলে ডাকে।

সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন হরগোবিন্দবাবু ; খুব সকালে, এক-একদিন রাত থাকতেই ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আর বিছানায় শুয়ে থাকেন না তিনি। বেড়াতে অর্থাৎ মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়েন।

সত্যভামা একটু গজগজ করেন। বুড়ি হাবুলের মাকে তাঁর সঙ্গে নেমে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করতে হয়, সেও একটু গজগজ করে। হরগোবিন্দবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে একটা লাঠি হাতে নিয়ে হনহন করে ময়দানের দিকে চলে যান।

আগে কদাচিৎ ময়দানে আসতেন হরগোবিন্দবাবু। পাড়ার মধ্যেই ফুটপাথে সকালবেলায় একটু হাঁটাহাঁটি করে নিতেন। কিন্তু এখন কিছুদিন হল ময়দানের নেশা চেপে বসেছে তাঁর। জলবৃষ্টি হলেও বাদ নেই, ছাতা মাথায় দিয়ে আসেন, না হলে লাঠি হাতে সকালে ঘন্টাদেড়েক ময়দানে বেড়ানো তাঁর অবশ্যই চাই।

এই ময়দানেই একদিন বিপত্তিটা ঘটল। হরগোবিন্দবাবু ময়দানে ভ্রমণকালে দেখেছেন এই সাত-সকালে তাঁর বয়েসী বুড়োরা পর্যন্ত

নানরকম উলটোপালটা জিনিস কিনে খায়। হজমি নুন দিয়ে লেবু-জল, কলে পেষানো আখের রস, এমনকী ঝালমুড়ি পর্যন্ত খায়।

হরগোবিন্দ একে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করেছেন, তাছাড়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। তিনি বুড়োদের এসব হাবিজাবি রাস্তাঘাটে খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু সেই তিনিই একদিন লোভে পড়ে গেলেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরের গেটের ঠিক বাঁ পাশে কয়েকদিন হল একটা লোক কালোজাম নিয়ে বসেছে। এত বড়-বড় কালো ঝকঝকে জাম সচরাচর চোখে পড়ে না। একদিন সকালে হঠাৎ লোকটার কাছ থেকে জাম কিনে বসলেন হরগোবিন্দবাবু। মনে মনে ভেবেছিলেন, বাড়িতে নিয়ে যাবেন কিন্তু তখনই তাঁর খেয়াল হল সকালবেলা একঠোঙা জাম নিয়ে বাসায় গেলে সত্যভামা চেঁচামেচি করবেন, হাবুলের মা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে। এই জাম ফলটা সত্যভামার দু'চোখের বিষ। ওদিকে আজ কয়েকদিন হল সত্যভামা বাজার থেকে একটা কাঁঠাল আনতে বলেছিলেন, সেটা তাঁর খেয়াল করে নিয়ে আর আসা হয়নি।

সুতরাং ফোর্টের দিকে যেতে-যেতে ঠোঙা থেকে একটা করে জাম মুখে ফেলে ঠোঙাটা শূন্য করে ফেললেন হরগোবিন্দ। এর মধ্যে একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল। রাস্তায় পাশের কী একটা গাছ থেকে গোলমতন একটা ফল হাতের জামের ঠোঙাটায় হঠাৎ এসে পড়ে। তখনও পাঁচ-সাতটা জাম ঠোঙার মধ্যে ছিল, হরগোবিন্দবাবু ঠোঙা থেকে বাইরের ফলটা ফেলে দেবার জন্য খুঁজলেন কিন্তু সেটাও বোধহয় জামের মতো দেখতে, ঠিক ধরতে পারলেন না। ভাবলেন এ-দিকটায় দু-একটা জামগাছও আছে, তারই থেকে একটা হয়তো ঠোঙায় পড়েছে।

কিন্তু একটা ফল মুখে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চিবোতে গিয়ে তাঁর মনে হল আরে এটা তো জাম নয় কেমন একটা অদ্ভুত স্বাদ, তেতো-তেতো অথচ মিষ্টি-মিষ্টি আবার একটু টক ভাবও আছে, একটু ঝালও লাগছে। তাড়াতাড়ি বিচনো বন্ধ করে মুখ থেকে ফলটা থুঃ থুঃ করে ফেলে দিলেন তিনি। কিন্তু তখন একটু তো খাওয়া হয়ে গেছে।

এর পরেই শুরু হল চমকপ্রদ ব্যাপার। সহসা হরগোবিন্দবাবু খেয়াল করলেন, তাঁর কেমন যেন হালকা-হালকা লাগছে। তিনি রাস্তা থেকে

pathagar.net

নেমে ডানদিকে ময়দানের মধ্যে ঢুকে গেলেন, সেখানে তখন দলে-দলে ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

একটা মাঠের ফুটবল সীমানা পেরিয়ে ঘাসের উপরে গড়াতে গড়াতে তাঁর পায়ের কাছে চলে এল, অন্য দিন এমন হলে তিনি বলটাকে এড়িয়ে যান। কিন্তু ছুটে গিয়ে আজ একটা কিক্ করলেন বলটায়, তারপর নিজের মনেই বললেন,

চপল ফুটবল করিছে খলবল।
চরণ-শতদল এখনও সম্বল ॥

বলেই হরগোবিন্দবাবুর কেমন খটকা লাগল, তিনি প্রাক্তন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ভবানীপুরের ছাপোষা মানুষ, হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে এ কী কথা বার হল ?

কিন্তু এত চিন্তা করার তখন আর তাঁর ফুরসত নেই। চরণ কথাটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে ; এদিকে যে বলটা মাঠের বাইরে থেকে কিক করে তিনি মাঠের মধ্যে ফেরত পাঠিয়েছিলেন সেটা একসঙ্গে পরপর তিনটে মাঠের তিনটে গোল ভেদ করে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল ; তিনি আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

শুধু লাফালেন তাই নয় লাফ থামানো মাত্র তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটি পদ্য ; সবচেয়ে আনন্দের কথা এর মধ্যেও চরণ শব্দটি আছে এবং তিনবার তিনটি গোলের উল্লেখ আছে।

চরণে চরণে হিন্দোল শুধু হিন্দোল,
দাও গোল—দাও গোল—দাও গোল।

তবে এবারের এই ছড়াটা কেমন যেন খটোমটো হয়ে গেল, গোল দিতে গিয়ে কোথায় যেন গোল বেধেছে ; কিন্তু সে সব উপেক্ষা করে তিনি দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হলেন, মুখে অনর্গল স্বরচিত পদ্য।

ময়দান পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে হরগোবিন্দ দেখলেন, একটা দোতলা বাস আসছে। অন্যদিনে হেঁটেই যান, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে বাসটায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তিনি যে যা-তা লোক নন, একজন স্বভাবকবি হয়ে গেছেন বাড়ি গিয়ে এটা যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব সত্যভামা এবং সেই সঙ্গে হাবুলের মাকে বোঝাতে হবে।

পদ্যভরা প্রাণে, ঝলমল খুশিতে বাসে উঠেই হরগোবিন্দ কন্ডাক্টরের সামনে গিয়ে তাঁকে হাত নেড়ে বললেন :

(ওগো) কন্ডাক্টর, তুমি বা কে কার ?
(ওগো) হরডাক্তার, আমি বা কে কার ?
(ওগো) ভোরবেলাকার ডবল ডেকার ?
(ওগো) আমরা কে কার, তোমরা কে কার ?

এমন আমুদে বুড়ো বহুদিন কন্ডাক্টর ভদ্রলোক দেখেননি, তবে এ-সবের মাথামুণ্ডু কোনও মানে ধরতে না পেরে তিনি ফ্যালফ্যাল করে হরগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ-সবের মানে হরগোবিন্দবাবুর কাছেও স্পষ্ট নয়, তিনি বাস থেকে সুড়ুত করে নেমে গেলেন। অবশ্য তাতে তাঁর সুবিধেই হল, উলটো দিকে অল্প গেলেই তার বাড়ি।

বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন হরগোবিন্দবাবু, দেখলেন ময়দান থেকে হেঁটে আসতে হয়নি বলে আজ প্রায় আধ ঘন্টা আগে বাড়ি ফিরেছেন।

খুশি মনে শিস দিতে গিয়ে হরগোবিন্দবাবুর মনে হল ফচকে ছেলের মতো এ-বয়েসে পাড়ার রাস্তায় শিস দেওয়া মানায় না, বরং মনে মনে তিনি নতুন এক পদ্যের প্রথম দু'কলি আওড়াতে লাগলেন, পদ্যটা এখনই মাথায় এল,

হরবাবু ভাল ভারী
ফেরে বাড়ি তাড়াতাড়ি ॥

[দুই]

পতন ও মূর্ছা

pathagar.net

হরগোবিন্দবাবু সকালবেলা ময়দান থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসে একবাটি মুড়ি আর এক কাপ চা খান, আর সেই সঙ্গে খবরের কাগজটা

পড়েন।

কিন্তু আজ তিনি আধঘন্টা আগে বাসায় ফিরেছেন। সিঁড়ির উপরের খবরের কাগজটা এখনও হকার ফেলে দিয়ে যায়নি আর চায়ের আয়োজন হতেও দেরি।

হরগোবিন্দবাবুর আর তর সইছে না, তাঁর মাথার মধ্যে পদ্য, ছড়া, কবিতা গিজগিজ করছে। তিনি তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে তাঁর বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে দেরাজ থেকে জমাখরচের খাতাটা বার করে পিছনের দিকের সাদা পাতাগুলো ভরিয়ে ফেললেন যা মাথায় আসে তাই লিখে।

প্রায় আধঘন্টা ধরে পাতার পর পাতা লেখার পরে হরগোবিন্দবাবুর খেয়াল হল চশমা ছাড়াই তিনি এতখানি লিখে ফেলেছেন, তাই চোখটা টনটন করছে আর কী যে লিখেছেন সেটাও পড়া যাচ্ছে না।

এদিকে চায়ের পিপাসাও বেশ লেগেছে। অন্যদিন এ-সময়ে খবরের কাগজ পড়েন সেটাও তাঁর খেয়াল হল।

হরগোবিন্দবাবু কবিতা-লেখা থামিয়ে চা, খবরের কাগজ ইত্যাদির জন্যে রান্নাঘরের দিকে হাঁক দিলেন, কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে যেন কিছুতেই সোজা কথা বার হল না, বরং তাঁর স্ত্রী সত্যভামার উদ্দেশে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় তাঁর মুখ থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি ছড়া বেরিয়ে এল।

চায়ের কাপ মুড়ির বাটি
আনন্দবাজার পত্রিকাটি
সত্যভামা, সত্যভামা
নিয়ে এসো আমার চশমা।

সেই মুহূর্তে রান্নাঘরে চায়ের কেতলিতে দুধ মেশাচ্ছিলেন সত্যভামা। আজ পঞ্চাশ বছর তাঁর বিয়ে হয়েছে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে, কোনও দিন হরগোবিন্দবাবুকে তিনি একটা গানের কলি পর্যন্ত ভাঁজতে শোনেননি, হঠাৎ আজ এই সকালে স্বামীর মুখে এমন মধুর পদ্য শুনে সত্যভামা চমকে উঠলেন, দুধের কড়াটা হাত থেকে পড়ে সারা ঘরময় গরম দুধ ছলকে গেল। কিছুটা গরম দুধ ছিটকে তাঁর পায়ে পড়ে বেশ ছ্যাঁকাও লেগে গেল।

pathagar.net

এই ধরনের ঘটনা বিপর্যয়ে সত্যভামা যখন বিমূঢ়, হরগোবিন্দবাবু তখন ভাবলেন সত্যভামা হয়তো কোনও কাজে আটকে গেছেন তাই সাড়া দিচ্ছেন না, অন্য সময় এমন হলে হাবুলের মা আসে, তাই এবার হাবুলের মার উদ্দেশে তিনি সেই আগের ছড়াটি আওড়ালেন। শুধু সামান্য পরিবর্তন, সত্যভামার জায়গায় হাবুলের মা,

চায়ের কাপ, মুড়ির বাটি
আনন্দবাজার পত্রিকাটি
হাবুলের মা, হাবুলের মা
নিয়ে এসো আমার চশমা।

হাবুলের মা একটু আগে সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছিল, তাই সে আগের ছড়া শুনতে পায়নি কিন্তু রান্নাঘরে দুধের কড়ার পতনের শব্দে সে বিপদগ্রস্তা সত্যভামার কাছে ছুটে এসেছে, একটা ভেজা গামছা দিয়ে সত্যভামার পায়ের গরম দুধ মুছে দিচ্ছে, এমন সময় ডাক্তারবাবুর এই আশ্চর্য পদ্য শুনে তার চোখ কপালে উঠল।

সর্বনাশ! ডাক্তারবাবু এরকম করছে কেন? তিরিশ বছর আগে চেতলাহাটে রামযাত্রায় হাবুলের মা এরকম ভাষায় কথা বলা শুনেছিল। তা ছাড়া সে আজ কম করেও পনেরো-বিশ বছর ডাক্তারবাবুর এখানে, তার চোখের সামনেই ডাক্তারবাবুর তিন মেয়ের পর পর বিয়ে হল, ডাক্তারবাবুর মুখে এরকম ভাষা সে কখনও শোনেনি।

হরগোবিন্দবাবুর কণ্ঠে দ্বিতীয় দফায় পদ্য শুনে এবং চির-অনুগতা হাবুলের মা'র হতচকিত ভাব দেখে এবার সতভামা সামলাতে পারলেন না, ছুটে বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে হরগোবিন্দবাবুকে বললেন, "তুমি এরকম করছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

সত্যভামা যে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেছেন সেদিকে কিন্তু হরগোবিন্দবাবুর খেয়াল নেই, তাঁর আবার কাব্যের আবেগ এসে গেছে। তিনি চশমাহীন চোখে বিনা বাধায় আবার তরতর করে পদ্য লিখে চলেছেন জমাখরচের খাতায়।

ইতিমধ্যে সত্যভামার পিছু-পিছু হাবুলের মাও বাইরে ঘরে এসে

pathagar.net

দাঁড়িয়েছে। হরগোবিন্দবাবু অবিরাম লিখে যাচ্ছেন, আর যা লিখছেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন।

হরগোবিন্দবাবু শান্ত, গোবেচারা, ছাপোষা মানুষ, যিনি কোনওদিন কোনও গোলমালে নিজেকে জড়াননি, সামান্য চা ছাড়া যাঁর কোনওদিন কোনও নেশা নেই, যিনি এই সেদিন পর্যন্ত বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, যাঁকে আজও পরিচিত লোকজন ডাক্তারবাবু বলে শ্রদ্ধা করে—আজ তাঁর এ কি অবস্থা ? সত্যভামা আর হাবুলের মা দুজনেই কিছুক্ষণ থ মেরে হরগোবিন্দবাবুর কাব্যরচনা এবং তৎসহ অস্ফুট কাব্যপাঠজনিত আবেগবিহ্বল অবস্থা দেখলেন, একসঙ্গে দুজনের বুক ফেটে মর্মস্পর্শী আর্তনাদ বার হল, "হায় ! হায় ! এ কী সর্বনাশ হল।"

কাব্যচর্চায় যতখানিই আত্মনিমগ্ন থাকুন, দুই মহিলার এই মর্মান্তিক আর্তনাদে হরগোবিন্দবাবুর ঘোর একটু কাটল। তিনি মুখ তুলে তাকাতেই সত্যভামা ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে, "ওগো, তোমার কী হল, তুমি এমন হলে কেন ?"

বাইরের ঘরের তক্তপোশে বুকে একটা বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে এতক্ষণ যে-হরগোবিন্দবাবু কাব্যচর্চায় ব্যস্ত ছিলেন, দুই মহিলার আর্তনাদ এবং তদুপরি সত্যভামার আকুতি শুনে তিনি এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তক্তপোশের উপরে, তারপর গড়গড় করে বলে চললেন ;

গিয়াছিনু ময়দানে ভিক্টোরিয়া হল।
তারই কাছাকাছি এক জ্ঞানবৃক্ষতল ॥
সেইখানে গুটি কয় মিঠা জামফল।
এবং অচেনা এক গোলগাল ফল ॥

এই পর্যন্ত বলে হরগোবিন্দ সহসা থেমে গেলেন, তারপর বললেন, "সত্যভামা, জামফল আর গোলগাল ফল, পরপর দু'বার হল, তোমার কানে লাগছে না ?"

এই অসম্ভব প্রশ্ন শুনে সত্যভামা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, সেই সঙ্গে হাবুলের মা, সে-ও কিছু না বুঝে ডুকরে উঠল।

কিন্তু হরগোবিন্দবাবু অদমিত, তিনি সেই তক্তপোশের উপর দাঁড়িয়ে

pathagar.net

কিন্তু হরগোবিন্দবাবু থমমিত ...!!

pathagar.net

আবার বলা শুরু করলেন :

গিয়েছিনু ময়দানে জ্ঞানবৃক্ষতল।
সেইখানে খেয়েছিনু গোলগাল ফল ॥
তদবধি চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।
তদবধি হল মোর চরণ চঞ্চল ॥
তদবধি চিত্ত মোর গোল ফুটবল।...

এর পরেও বোধহয় আরও কিছু ছিল, কিন্তু ওই ফুটবলে এসে হরগোবিন্দবাবু সহসা এমন এক গগনভেদী লাফ মারলেন যে ছাদের সিলিং পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে মাথায় এক ঠোক্কর খেয়ে তিনি চিতপাত হয়ে পড়লেন তক্তপোশের উপরে, তখনও কিন্তু তাঁর পদ্যের আবেগ, এই আঘাতের পরেও, কোনও রকম প্রশমিত হল না, তাঁর কপালের উপরে মাথার নীচে যেখানে ধাক্কা লেগেছিল, সে জায়গাটা একটা বড় সুপুরির মতো ফুলে উঠল, তবু তক্তপোশে চিতপাত হয়ে পড়ে, কাতরাতে-কাতরাতে তিনি আওড়াতে লাগলেন,

তক্তপোশের সঙ্গে আপোস
হরগোবিন্দ করবে না,
ছাদের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে
হরগোবিন্দ মরবে না।

[তিন]

আর্নিকাকে কে মনে রাখে

হরগোবিন্দবাবুর এই তেজ কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। সেই অদ্ভুত ফল খাওয়ার জন্যেই হোক কিংবা মাথায় চোট খাওয়ার জন্যে হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর কবিতার আবেগ বন্ধ হল, তিনি চোখ বুজে তক্তপোশের উপরে এলিয়ে পড়ে গেলেন।

pathagar.net

স্বামীকে প্রথমে পদ্যে পাওয়ায় এবং তারপরে তাঁর লাফ দিয়ে আহত হয়ে মূর্ছা যাওয়ায়, বিশেষ করে এই সব অকল্পনীয় ঘটনার আকস্মিকতায় সত্যভামা দেবী বৈঠকখানা-ঘরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

ভয় ও কাঁপুনি ব্যাপারটা অত্যন্ত সংক্রামক, সত্যভামা দেবী যতটা কাঁপতে লাগলেন, তার দ্বিগুণ কাঁপতে লাগল হাবুলের মা। দু'জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কম্প প্রতিযোগিতা শুরু হল। পাশের বাড়ির দোতলা থেকে হঠাৎ এই দৃশ্য চোখে পড়ল ভবানীবাবুর স্ত্রীর।

ভবানীবাবু আলিপুর আদালতে ওকালতি করেন। ভবানীবাবুরা হরগোবিন্দবাবুদের বহুকালের প্রতিবেশী। ভবানীবাবুর স্ত্রী হেমলতা সত্যভামা দেবীকে পাড়াসুবাদে 'দিদি' বলেন। তিনি দিদির ও তাঁর পরিচারিকার অস্বাভাবিক কাঁপুনি দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন।

পাড়ায় অনেক বাড়িতে অনেক রকম উলটোপালটা অঘটন ঘটে। এই তো সেদিন গলির পাশের সামন্তদের বাড়ির বুড়ো হুলো বেড়াল খেপে গিয়ে বাড়ির প্রায় সমস্ত লোককে কামড়ে, আঁচড়ে হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিয়েছিল। আরেকদিন ও-দিকের একটা বাড়ির ছোট ছেলে বাথরুমে ছিটকিনি দিয়ে আর খুলতে পারে না, শেষে পাড়ার লোকে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ছেলেটাকে বার করল।

কিন্তু হরগোবিন্দবাবুদের বাড়িতে চিরকালই সবকিছু ঠিকঠাক স্বাভাবিক মতো হয়। কোনওদিন কোনও গোলমাল, হৈচৈ হেমলতা ও-বাড়িতে দেখেননি। সুতরাং আজ তিনি হরগোবিন্দবাবুর বৈঠকখানা-ঘরের দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তবুও মন্দের ভাল যে, হেমলতা হরগোবিন্দবাবুর পদ্যপাঠ এবং লাফ দেখেননি।

সে যা হোক, তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে হেমলতা তাঁর ছোট ছেলে অনাদিকে পাঠালেন পাশের বাড়িতে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে।

বছর পনেরো বয়েস হবে অনাদির, মিত্র স্কুল থেকে এবার মাধ্যমিক দেবে। সে হরগোবিন্দবাবুকে জ্যাঠামশায় এবং সতভামা দেবীকে মাসিমা

pathagar.net

বলে।

দু-মিনিটের মধ্যে অনাদি ছুটে হরগোবিন্দবাবুর দোতলায় উঠে গেল। দোতলায় সিঁড়ির ডানপাশে রান্নাঘর, সেখানে দুধের পাত্র উলটে পড়ে আছে, ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়া দুধ একটা বুড়ো বেড়াল বসে চেটে চেটে খাচ্ছে।

বুড়ো বেড়ালটাকে দেখে অনাদি ভুল করে বসল। সে ভাবল কয়েকদিন আগে সামন্তদের বাড়িতে যা হয়েছে, আজ এ-বাড়িতেও তাই হল, বাড়ির সবাইকে নিশ্চয় বেড়ালে কামড়েছে। সে নিজেও ভয় পেয়ে বেড়ালের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে চলে এল।

ছেলের ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে হেমলতা যখন প্রশ্ন করলেন, "কী রে, কী হল?" অনাদি তখনও হাঁফাচ্ছে। সে দম নিয়ে বলল, "বেড়াল," তারপর আবার দম নিল এবং বলল, "মাসিমাদের বেড়ালে কামড়েছে।"

কথাটা মুহূর্তের মধ্যে পাড়ায় রটে গেল। পাড়ায় যেখানে যত সাহসী লোক ছিল সবাই দল বেঁধে, কেউ লাঠি নিয়ে, কেউ বঁটি, দা, কেউ কাটারি, কেউ কয়লাভাঙার হাতুড়ি এইসব নিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে হরগোবিন্দবাবুদের বাড়ির দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

এদিকে দুধের কড়া উলটে যে দুধটুকু রান্নাঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সবটুকু এবং সেইসঙ্গে দুধের কড়ার গায়ে যে ছিটেফোঁটা দুধ তখনও লেগে ছিল সেটুকু চেটেপুটে খেয়ে বুড়ো বেড়ালটা তখন হাওয়া হয়ে গেছে। কোথাও সামান্য দুধের বা বেড়ালের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সকলের আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল অনাদি, সে হাতের কাছে লাঠিসোটা না পেয়ে তার বাবার টেবিল থেকে চামড়ায় বাঁধানো বড় ইংরেজি অভিধানটা নিয়ে এসেছিল তেমন বিপদ হলে বেড়ালটার গায়ে ছুঁড়ে মারবে বলে।

অনাদিই প্রথম অবাক হল, রান্নাঘরের দরজা সেই রকমই হাটখোলা, কিন্তু বেড়ালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অনাদির পিছে-পিছে সশস্ত্র

pathagar.net

হরগোবিন্দবাবু যত এগোন, জনতা তত পেছোতে থাকে...

pathagar.net

জনতা তারাও বেড়াল খুঁজছে, কিন্তু কোথায় বেড়াল ?

বেড়ালের খোঁজে এর পরেই সবাই ঢুকল বৈঠকখানায়, সেখানে তখনও হতভম্ব সত্যভামা এবং হাবুলের মা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একসঙ্গে লাঠিসোটা নিয়ে পাড়ায় সব লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দেখে, কিছু না বুঝে সত্যভামা 'আঁ-আঁ-আঁ' করে চেঁচিয়ে উঠলেন, কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে অধিকতর উচ্চনাদে হাবুলের মা 'আঁ-আঁ-আঁ' করে উঠল।

পাড়ার লোকেরা এ-রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেনি, তারা বেড়াল মারতে এসেছিল। তারা এই গুরুতর আর্তনাদের সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এদিকে এই পরপর দুটি প্রাণঘাতী চেঁচানিতে, সেই সঙ্গে এত লোকের হট্টগোলে সংবিৎ ফিরে এল হরগোবিন্দবাবুর, তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

একসঙ্গে এত লোক মারমুখী অবস্থায় নিজের ঘরের মধ্যে দেখলে এবং সেই সঙ্গে বাড়ির লোকের কাতর আর্তনাদ শুনলে যে-কোনও লোক আবার ভিরমি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত, কিন্তু ময়দানের সেই অজ্ঞাতপরিচয় ফল খেয়েই বোধহয় আজ তাঁর মনে রাগ নেই, ভয় নেই, শুধু আনন্দ আর পদ্য।

এখনও মাথাটা সিলিংয়ের ধাক্কার চোটটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বেশ ঝিমঝিম করছে, তবু হরগোবিন্দ হাসিমুখে বিছানা থেকে উঠে এলেন, তারপর হাত তুলে আশীর্বাদ দানের ভঙ্গিতে সত্যভামা আর হাবুলের মাকে আর চেঁচাতে মানা করলেন। দুই মহিলা একটু থামতে তিনি অপেক্ষমান, কৌতূহলী জনতার দিকে ধীরে ধীরে এগোলেন।

ইতিমধ্যে হরগোবিন্দবাবুর কপালের উপরের জায়গাটা এখন আর সুপুরির মতো নয়, প্রায় একটা ছোট বেলের আকার ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁর চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল মুখে খ্যাপা হাসি, তাঁকে দেখে সমঝদার লোকদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

হরগোবিন্দবাবু যত হাসিমুখে গুটিগুটি এগোন, জনতা তত পিছোতে থাকে, জনতা প্রায় সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত পিছিয়েছে এমন সময় তিনি হঠাৎ দু'হাত সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন :

pathagar.net

ওরে লাঠি, ওরে বঁটি, ওরে ও কাটারি।
তোদের চিবিয়ে আজ আমি খেতে পারি ॥
ওরে বঁটি, ও কাটারি, ওরে ওরে লাঠি।
একে একে চলে আয় ধরে ধরে কাটি ॥
ও কাটারি, ওরে লাঠি, ওরে ওরে বঁটি।
আয় দেখি চলে আয় তোরা সব ক'টি ॥

এই সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে গান শেষ হওয়ার ঢের আগে সমস্ত বীরপুরুষেরা, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, খেয়ে ফেললে রে," ইত্যাদি কাতরোক্তি সহকারে সিঁড়ি বেয়ে ধাক্কাধাক্কি করে দৌড়ে পালাল। কারও পায়ের চটি, কারও হাতের লাঠি, অনাদির হাতের ডিকশনারি এই সব সিঁড়ির উপর পড়ে রইল। যে যার মতো প্রাণ নিয়ে ছুটল।

হরগোবিন্দবাবু সিঁড়ির উপরে গিয়ে অনাদির ফেলে যাওয়া মোটা ইংরেজি অভিধানটা কুড়িয়ে নিলেন, তারপর বই খুলে পাতা ওলটাতে ওলটাতে ইংরেজি সুরে গান ধরলেন :

জাংশানে ফাংশানে আনশান,
ফিকশান টিকশান খানখান,
কোচোয়ান টোচোয়ান ধরে আন।

টোচোয়ানে এসে হরগোবিন্দবাবুর খটকা লাগল টোচোয়ান শব্দটা ইংরেজি কি না, ইংরেজি অভিধানের পাতা উলটিয়ে শব্দটা বার করতে গিয়ে গানের খেইটা হারিয়ে ফেললেন তিনি। বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে অভিধানটা আবার সিঁড়ির উপরে ছুড়ে দিলেন। তারপর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে তাকের উপরের থেকে অনেকদিন ফেলে-রাখা ধুলো-জমা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইটা হাতে তুলে নিলেন।

বইটা খুলে পাতা ওলটাতে-ওলটাতে প্রসন্ন আনন্দে মন ভরে গেল হরগোবিন্দবাবুর। হ্যাঁ, এই হল বই বটে, কী চমৎকার পদ্য হবে সব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল পদ্য বার হতে লাগল।

শুধুই গান শুধুই পূজা। শূন্য পেটে একটু থুজা ॥
ভরদুপুরে কাকের ডাকে। আর্নিকাকে কে মনে রাখে ॥

pathagar.net

ব্রায়োনিয়ার ইয়ারগন। সন্ধ্যারাতে কী কত কন ॥
যেমন কাজ তেমন লীলা। পালসেটিলা পালসেটিলা ॥

[চার]

রাম-ডাক্তার

কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত পাড়ায় রটে গেল বেড়ালের কামড়ে হরগোবিন্দবাবুর বাড়ির সমস্ত লোক ধুম-পাগল্ হয়ে গেছে। কী করা যায়, কী করে এই সময় বিপদ থেকে হরগোবিন্দ-ডাক্তারের পরিবারকে রক্ষা করা যায়। তাই নিয়ে শুরু হল গলির মধ্যে ছোট-বড় জটলা।

কেউ বলছে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বিশেষজ্ঞ পশু-চিকিৎসককে নিয়ে আসা যাক, তিনি নিশ্চয় এর ওষুধ বলতে পারবেন, চিড়িয়াখানায় বাঘ-সিংহ-বাঁদর কত লোককে কামড়ায় তিনি নিশ্চয় সব জানেন, বেড়ালের কামড়ের প্রতিষেধক জানেন।

অন্যেরা বলছে, "দূর ছাই। হরগোবিন্দবাবুরা তো আর পশু নয়, পশু হল বেড়াল। বরং হাসপাতালে নিয়ে যাই, সেখানে দেখবে।" আর-একদল বলছে, "হাসপাতালে গেলে কচু হবে, হাজরার মোড়ে গিয়ে উন্মাদ আশ্রমের রামডাক্তারকে ডেকে আনো।"

এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা জানে না, রাম-ডাক্তারের সঙ্গে হরগোবিন্দ-ডাক্তার অর্থাৎ হর-ডাক্তারের সম্পর্ক কী রকম।

রাম-ডাক্তার আর হর-ডাক্তার পুরনো বন্ধু, অথবা বলা উচিত পুরনো শত্রু। সাউথ সুবার্বন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দু'জনের পরিচয়। হরগোবিন্দের সঙ্গে রামশঙ্করের অর্থাৎ রামের এক সময় এত গলায় গলায় ভাব ছিল যে একত্রে এদের দু'জনকে সংক্ষিপ্ত করে হরে-রাম বলা হত। তাঁদের এই যুগ্ম নামকরণ সত্যিই সার্থক হয়েছিল। সে সময়ে এই

হরেরাম নামক দ্বন্দ্ব সমাসটিকে শুধু রাতে ঘুমনোর সময় আর দুপুরে খাওয়ার সময় ছাড়া আর কখনও আলাদাভাবে দেখতে পাওয়া যেত না।

দুজনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, দুজনেই সেকেন্ড ডিভিশনে। সেকালের সেকেন্ড ডিভিশন চাট্টিখানি কথা নয়। হরগোবিন্দবাবু কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু রামবাবুর বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, তাঁর কলেজে পড়া হল না।

ঠাকুরপুকুরের কাছে তখন এক পাগলাবাবা থাকতেন। বাবা নিজে পাগল ছিলেন না, কিন্তু বাবা ছিলেন পাগলের টোটকা চিকিৎসক, তাঁর চিকিৎসা-ব্যবস্থার নাম মুষ্টিযোগ।

মুষ্টিযোগ মানে মারধোর নয়, তবে কিছুটা মারধোরও প্রয়োজনে বোধহয় দরকার পড়ে পাগলের চিকিৎসায়। অব্যর্থ চিকিৎসা ছিল পাগলাবাবার। হাজার-হাজার পাগল তাঁর হাতে ভাল হয়েছিল। দুর্দান্ত, কুখ্যাত, ডাকসাইটে পাগলের পাগলাবাবার নামে থরথর করে কাঁপত।

কাঁপারই কথা। বিশাল দশাসই চেহারা। কপালে আধুলি সাইজের লাল টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা, সঙ্গে লাল রেশমের আলখাল্লা, কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল, ঘোলাটে চোখ, আর বাজখাঁই গলা—যা কিছু একজন মানুষকে ভয়াবহ করার জন্যে দরকার সবই ছিল পাগলাবাবার।

জীবিকার অন্বেষণে রামশঙ্কর সেই পাগলাবাবার চেলা হয়ে গেলেন। চার বছর পাগলাবাবার পা টিপে, রান্না করে, পাগলাবাবার উন্মাদ রোগীদের হাতে মারধোর খেয়ে বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে রামশঙ্কর মুষ্টিযোগ কিছুটা শিখলেন।

চেলাগিরি শেষ হল পাগলাবাবার মৃত্যুতে, তখন রামশঙ্কর এসে হাজরার বাড়িতে 'উন্মাদ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে বড় সাইনবোর্ডে লিখে দিলেন :

উন্মাদ আশ্রম

মুষ্টিযোগ প্রক্রিয়ায় যে-কোনও প্রকার পাগল নূতন, পুরাতন, নিরীহ, দুর্দান্ত সকল পাগল আরোগ্য হয়।

pathagar.net

প্রথম প্রথম রোগী হয়নি। তখন হরগোবিন্দ খুব সাহায্য করেছিলেন

রামশঙ্করকে, বছরে দুবার পালা করে পাগল সাজতেন, তারপর রামশঙ্কর তাঁকে ভাল করে তুলতেন। এই ভাবে রাম-ডাক্তারের নাম হতে লাগল।

এর মধ্যে পরপর দুবার বি. এ. ফেল করার পরে এবং রাম-ডাক্তারের প্র্যাকটিস লাগতে দেখে হরগোবিন্দও ডাকযোগে হ্যামিওপ্যাথিক পাশ করে একটা ওষুধের বাক্স আর পারিবারিক হোমিও চিকিৎসা বই কিনে হর-ডাক্তার হয়ে বাড়ির নীচের বাইরের ঘরে চেম্বার খুলে বসলেন।

তখন দুজনের মধ্যে লাগল সংঘাত। একবার হর-ডাক্তারের এক রোগী পাগল হয়ে যেতে তাকে রাম-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পরে হর-ডাক্তার পরম্পর শুনতে পেলেন, রাম-ডাক্তার নাকি বলেছে হরের ওষুধ খেয়ে পাগল হয়েছে।

ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তেজিত হর-ডাক্তার চারদিকে রটাতে লাগলেন, রামটা তো রামবোকা। ও আবার ডাক্তার হল কবে? বুজরুকি করে লোক ঠকায়, পাগলদের শোষণ করে।

অতঃপর যা হবার হল। দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা, মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হল। সে-ও আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

একই পাড়ার দু'প্রান্তে দু'জন থাকেন। কখনও-সখনও বাজারে সভা-সমিতিতে বা বিয়েবাড়িতে দুজনের দেখা যে হয়নি তা নয়, তবে দুজনেই সঙ্গে-সঙ্গে দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তারপর তো হর-ডাক্তার ডাক্তারিও ছেড়ে দিলেন একদিন। আজকাল আর সকালবেলা বেড়াতে যাওয়া ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ বার হন না হরগোবিন্দ, রামের সঙ্গে আর দেখাও হয় না। পুরনো ভালবাসা যেমন আর ফিরে আসেনি, রেষারেষির ভাবটাও সময়ের সঙ্গে কবে ভেসে গেছে।

পাড়ার লোকেরা রাম-ডাক্তার আর হর-ডাক্তারের এসব আদ্যিকালের ব্যাপার কিছু জানে না। তারা অনেক চিন্তা-চরিত্র করে অবশেষে স্থির করল হর-ডাক্তারের বাড়ির সবাই যখন বেড়ালের কামড়েই হোক অথবা যে-কোনও কারণেই হোক পাগল হয়ে গেছে তাহলে, হাতের কাছে বিখ্যাত পাগলের ডাক্তার রামশঙ্কর থাকতে আর কাউকে প্রথমে ডাকার

pathagar.net

মানে হয় না।

সুতরাং অনতিবিলম্বে একদল প্রতিবেশী ছুটল হাজরার দিকে উন্মাদ আশ্রমে রাম-ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্যে। রাম-ডাক্তারও সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকেন নতুন-নতুন পাগলের জন্যে। সুতরাং কল পাওয়া মাত্র তিনি কোথায়, কী বৃত্তান্ত কিছু খবর না নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নতুন রোগীর উদ্দেশে।

[পাঁচ]

পুনর্মিলন

যা হোক এবার আরেকবার আমরা হর-ডাক্তারের বাড়িতে ফিরে আসি। সব লোক তাড়িয়ে দিয়ে যখন অনাদির বাবার ইংরেজি অভিধান খুলে হরগোবিন্দ গান গাইতে গাইতে বইটা সিঁড়িটার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৈঠকখানা-ঘরে এসে ঢুকলেন এবং তারপর তাকের উপর থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইটা নামিয়ে পাতা খুললেন, তখন সত্যভামা দেবী ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম জপ করতে লাগলেন।

আসলে ইতিমধ্যে সত্যভামা কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়েছেন হাবুলের মা'র কাঁদাকাটিও থেমেছে। তবে বাড়ির মধ্যে এত লোক কেন তাড়া করে উঠে এসেছিল সে বিষয়ে তাঁর এবং হাবুলের মা দুজনেরই বিশেষ সংশয় দেখা দিয়েছে।

সে যা হোক, স্বামী যখন ইংরেজি গান বন্ধ করে ইংরেজি অভিধান ছুঁড়ে ফেলে হোমিওপ্যাথিক বই বহুদিন পরে খুললেন, সত্যভামা দেবীর মনে একটু আশার সঞ্চার হল। হাজার হলেও ডাক্তার তো, বই খুলে এবার চিকিৎসার ওষুধ নিজেই বার করবে। কিন্তু সে জায়গায় যেই হরগোবিন্দবাবু 'পালসেটিলা-পালসেটিলা' বলে গান গেয়ে উঠলেন, সত্যভামা পুনরায় মুষড়ে পড়লেন।

স্ত্রী কিংবা পরিচারিকার বিহ্বলভাব লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা

pathagar.net

আশ্বরক্ষার জন্য সম্পূর্ন প্রস্তুত হয়ে এসেছেন বাম ডাক্তার!

pathagar.net

এখন হরগোবিন্দের নেই। তিনি তাঁর ডাক্তারির বই আবার তাকে তুলে রেখে তক্তপোশে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে জমাখরচের খাতা খুলে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে লিখতে লাগলেন।

বালিশ চাইছে পালিশ
বালিশ চাইছে মালিশ
বালিশ বালিশ বালিশ
বালিশ কেন যে পালিস ?

এ পর্যন্ত লিখে তিনি বিছানায় উঠে বসে বালিশটাকে ছুঁড়ে মারলেন হাবুলের মা'র দিকে, আসলে এখন তাঁর খুব খিদে লেগেছে। সাতসকালে কয়েকটা জাম আর সেই ফলটা অল্প খেয়েছিলেন, চা-মুড়ি আজ কিছু খাওয়া হয়নি, পেট চুঁই-চুঁই করছে, তাঁর খুব ডাল-ভাত-মাছ-শাক এইসব এখন পেট পুরে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি তক্তপোশের ওপরে বসে খাতাটাকে টেনে নিয়ে লিখতে লাগলেন :

ভাত ডাল শাক মাছ। শাকগাছ নয় গাছ ॥
শাক মাছ ভাত ডাল। ভাতে বাড়ে মিহি চাল ॥
ডাল ভাত মাছ শাক। শাক দিয়ে মাছ ঢাক ॥
মাছ শাক ডাল ভাত। ছড়া লিখে প্রাণপাত ॥

কিন্তু এই ছড়াটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে রাম-ডাক্তার দোতলায় উঠে এলেন, তাঁর পিছে বেশ কিছু সাহসী ও কৌতূহলী ব্যক্তি।

খ্যাপা বেড়াল এবং অথবা খ্যাপা বেড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির কামড়ানো বা আঁচড়ানো থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছেন রাম-ডাক্তার। রবারের ওয়াটারপ্রুফ বর্ষাতিতে তাঁর সারা শরীর ঢাকা, হাতে চামড়ার দস্তানা, পায়ে গামবুট। হাতে, পায়ে শরীরে কোথাও কামড়ানো, আঁচড়ানো সাধ্যি হবে না কোনও মানুষের বা জন্তুর।

আসলে এটাই রাম-ডাক্তারের কলে বেরোবার পোশাক, তাঁকে প্রায়ই দুর্দান্ত রোগীকে ধরে আনতে হয়। বহু সময় চেম্বারেও তিনি এই পোশাক পরে থাকেন। এই পোশাকে শুধু শরীর বাঁচে তাই নয়, রোগী

pathagar.net

এবং রোগীর আত্মীয়েরা এই পোশাকের জন্যে তাঁকে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখে।

বৈঠকখানা ঘরের তক্তপোশ থেকে হরগোবিন্দ রাম-ডাক্তারকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখলেন, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে, অনেকদিন দেখেননি, কিন্তু এ-মুখ সহজে ভোলার নয়। কিমভূতকিমাকার পোশাক পরে এসেও রামশঙ্কর যে আত্মগোপন করতে পারলেন না সেটা ভেবে হরগোবিন্দ হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

এদিকে রাম-ডাক্তারেরও কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল এ বাড়িটা। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে এই দোতলার সিঁড়িতে উঠলেন, কিন্তু এই সিঁড়ির ডানহাতি বাঁকটা তাঁর চেনা। এই সামনের দিকে রান্নাঘর, ওখানে বসে হরের মা'র হাতের তৈরি মোহনভোগ, পায়েস, কতবার খেয়েছেন রামশঙ্কর, সে কি আজকের কথা, অথচ মনে হয় যেন গতকাল। পাশের জমিটায় একটা বুড়ো নারকেলগাছ ছিল, না এতদিন পরে সেখানে আর কিছু নেই, জানলা দিয়ে দেখলেন রামশঙ্কর, একটা বড় বাড়ি উঠেছে সেখানে, সেটাও বেশ পুরনো হতে চলল।

হরগোবিন্দকে দেখেই চিনতে পেরেছেন রামশঙ্কর এবং স্বভাবতই তাঁর অট্টহাসি শুনে তিনি মোটেই ভীত হননি। আর তা ছাড়া তিনি অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞ বিখ্যাত উন্মাদ-চিকিৎসক, এরকম অট্টহাসি শোনা তাঁর যথেষ্টই অভ্যাস। এর থেকে মারাত্মক কোনও অঘটন ঘটলেও তিনি বিচলিত হতেন না।

ওদিকে অট্টহাসির পিছনেই অপেক্ষা করছিল উষ্ণ অভ্যর্থনা। কাব্যের ঝরনা কুলকুল করে বইতে লাগল হরগোবিন্দের কণ্ঠে :

ধন্য ধন্য রাম-ডাক্তার, অপার অসীম মহিমা তোমার,
আজিকে এসেছ আমার ঘরে।
আগের মতন আজ আর আমি, করি না তোর আর সাজা পাগলামি,
আমি উন্মাদ বাণীর বরে ॥

pathagar.net

পুরনো বন্ধুর মুখে অসম্ভব পদ্য শুনে রাম-ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। পুরো উপসর্গটা তাঁর পরিচিত। এ-রকম তিনি আজকাল খুবই দেখছেন।

ততক্ষণে হরগোবিন্দ পদ্যে আরও বিস্তারিত হয়েছেন, তিনি বলে চলেছেন,

ধন্য ধন্য রামশঙ্কর, পবিত্র হল আমাদের ঘর,
আজিকে তোমার চরণ পেয়ে।
কেবা আজি পর কেই বা আপন,
এসো ব্রাহ্মণ একটু শুচি করি মন...

এই শেষের জায়গাটায় এসে হরগোবিন্দ একটু ঘুলিয়ে গেলেন, এই শেষের জায়গাটা সেই ১৯৩০ সালে সাউথ সুবার্বন স্কুলে বাংলা বইতে পড়েছেন, পুরনো বন্ধুকে দেখে এতদিন পরে মনে পড়ে গেল। একবার মাথা ঝাঁকি দিলেন হরগোবিন্দ। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'আশ্চর্য !

ততক্ষণে রাম-ডাক্তার নমস্কার করে ঘরের প্রান্তে দাঁড়ানো সত্যভামা দেবীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। বললেন, "আমরা দুজনে বাল্যবন্ধু। মধ্যে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর দেখাশোনা নেই। এই হরগোবিন্দের ব্যারামটা আমি ধরে ফেলেছি ওর পদ্য শুনে, লাল চোখ আর হাবভাব দেখে। আপনি শুধু আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন।"

আজ সকাল থেকে একের পর এক বিচিত্র ঘটনায় সত্যভামা হতভম্ব হয়ে গেছেন, তবুও রাম-ডাক্তারের প্রশ্নগুলির তিনি যথাসাধ্য জবাব দিলেন।

রামডাক্তার প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "হর ময়দানে ভিক্টোরিয়ার দিকে বেড়াতে যায় ?" সত্যভামা ঘাড় কাত করে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" রাম-ডাক্তার উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "যেতেই হবে।" তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, "সকালে সূর্য ওঠার আগে ?" সত্যভামা আবার ঘাড় কাত করলেন। এবার রামডাক্তার রীতিমত উত্তেজিত, জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কোনও অচেনা, গোল, কালো ফল খেয়েছিল ?"

pathagar.net

এই প্রশ্নের সত্যভামা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই, স্বয়ং হরগোবিন্দ জবাব দিতে এগিয়ে এলেন, তারপর সেই আগের কবিতাটা আবার বললেন :

গিয়েছিনু ময়দানে জ্ঞানবৃক্ষতল।
সেইখানে খেয়েছিনু গোলগাল ফল !
তদবধি চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।

এই পর্যন্ত শুনেই হরগোবিন্দকে রাম-ডাক্তার থামিয়ে দিলেন, এখন তিনি এই পদ্য শুনে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। এখন পর্যন্ত রামডাক্তার বহু পাগলের চিকিৎসা করেছেন যারা হঠাৎ কবি হয়ে গেছে এবং যাদের পায়ে ও শরীরে এটা আকস্মিক লঘুভাব এসেছে। এরা সবাই ময়দানে ভিক্টোরিয়ার কাছে বেড়াতে গিয়ে জাম ভেবে অন্য একটা অচেনা ফল খেয়েছে। প্রত্যেক বছরই গ্রীষ্মের শেষে এই রোগটা অল্পবিস্তর দেখা যায়।

রাম-ডাক্তার সব রোগীর কাছ থেকে জনে জনে জানতে চেয়েছেন গাছটা কোথায়। কেউ বলতে চায়নি, কোনও পাগল তার গোপনকথা বলতে চায় না, শুধু হাত নেড়ে বলেছে,

সেইখানে খেয়েছিনু গোলগাল ফল।'

বহু পাগলকে জেরা করে এবং কিছু সরল পাগলের স্বীকারোক্তি থেকে দীর্ঘ গবেষণা করে রাম-ডাক্তার ধরতে পেরেছিলেন এই গোলগাল ফলে প্রতিক্রিয়া হয় সূর্যোদয়ের আগে এবং এটা বছরে মাত্র দশদিন ফলে ময়দানের ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি একটা গাছে।

কিন্তু তীক্ষ্ণধী রাম-ডাক্তার যতবার এ-রকম রোগী পেয়েছেন সবই ওই দশদিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে। ফলে ওই গাছটাকে আর ধরা যায়নি।

রাম-ডাক্তার আরও অবিষ্কার করেছেন, এই কাব্যরোগ ব্যাপারটা খারাপ নয়। নিজের অজান্তে চমৎকার সব সত্যিমিথ্যে কথা বলা যায়, ভাষাটা মধুর বলে কেউ কিছু মনে করে না, তা ছাড়া কবি হওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। একটু দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি আছে কিন্তু পুরো

ব্যাপারটা খুবই মজার।

গরিবের ছেলে রামশঙ্কর, সারাজীবন পাগল চরিয়ে খেয়েছেন, তিনি পাগল হতে চান না, কিন্তু তাঁর খুব ইচ্ছে কবি হতে। তিনি জানেন, এতকাল পরে এই সত্তর বছর বয়সে সহসা কবি হওয়া কঠিন, কিন্তু ময়দানের ভোরবেলার মরসুমি গোলগাল ফল খেয়ে কাব্যপাগল বা পাগল-কবি হলেই বা আপত্তি কী!

রাম-ডাক্তার মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, এ-বছরে ঐ কাব্যফলের মেয়াদ এখনও একদিন আছে। সুতরাং বাল্যবন্ধু হরগোবিন্দ যদি তাঁকে গাছটা একবার দেখায় তিনিও একবার চেষ্টা করে দেখতেন। তিনি হরগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই হর, গাছটা কোথায় আছে, একবার দেখাতে পারবি?"

হরগোবিন্দ বললেন :

ও গাছ তোমার, ও গাছ আমার,
একবার নয় বহু শতবার,
ও গাছ তোমাকে আছে দেখাবার ॥

আনন্দের আতিশয্যে রাম-ডাক্তার মাথা গরম করে ফেলতে পারতেন, কিন্তু আজ তিনি কবি হতে চলেছেন, কবি হওয়ার আগে মাথা গরম করার মানে হয় না, তিনি বললেন, "হর, কাল ভোরবেলা পর্যন্ত ঠিক থাক, আমি তোকে ডেকে নিয়ে ময়দানে যাব।'

[ছয়]

কবিতা, কবিতা

পরদিন শুকতারা সাদা হওয়ার আগেই, হরিশ পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে প্রথম কাক ডাকবার আগেই হাজরার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাম-ডাক্তার হরিশ মুখার্জি রোডের একটা গলিতে এসে হর-ডাক্তারকে ডেকে ময়দানের দিকে চললেন।

pathagar.net

সারারাত জেগে হরগোবিন্দ কবিতা লিখেছেন, জমাখরচের খাতা শেষ হয়ে গেছে, ধোপার খাতা, ঘরের দেয়াল সর্বত্র পদ্যে ছড়ায় ভরে দিয়েছেন তিনি ; কিন্তু বাল্যবন্ধুর ডাক শুনে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রাত। আকাশে এখনও চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা ভেজা-ভেজা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার হয়ে দুই বন্ধু ময়দানের পাশে পড়লেন। সবুজ, নতুন ভেজা ঘাস, ডান দিকে, আর বাঁ দিকে ঝকঝকে কালো পিচের রাস্তা। পুবের থেকে নতুন বর্ষার হাওয়া বইছে।

এক জায়গায় এসে হর-ডাক্তার থেমে গেলেন, এক অতিকায় বনস্পতির নীচে ঘাসের উপরে পড়ে রয়েছে অল্প কিছু গোলগাল কালো ফল, এই মরসুমের শেষ ফসল।

দুটো ফল তুলে নিয়ে একটা বন্ধুর মুখে গুঁজে দিয়ে হর-ডাক্তার বললেন, "নে, খা।" আরেকটা নিজের মুখে পুরলেন।

তারপর ?

তারপর আর কিছু নেই। এই যে আজকাল কাগজে কাগজে এত কবিতা, কবিতা আর কবিতা ; স্বনামে বেনামে তার সিকিভাগ লেখেন হর-ডাক্তার আর সিকিভাগ লেখেন রাম-ডাক্তার, বাকি অর্ধেক কারা লেখে, কে জানে !

pathagar.net

উঁকিঝুঁকি

[এক]

বাপরে বাপ

এখন দুপুর দুটো। মাসিক 'উঁকিঝুঁকি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রসময় মজুমদার মহোদয় নিজের দপ্তরে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। যে-কেউ দেখলে ভাববে তিনি নিজের কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। রসময়বাবু মোটেই দায়িত্বহীন সম্পাদক নন। তিনি তাঁর উঁকিঝুঁকি পত্রিকায় যত লেখা আসে সব নিজে পড়েন। যে-সব লেখক নিজের হাতে কাগজের অফিসে এসে লেখা দিয়ে যান, আরও যে-সব লেখা ডাকে বা লোকমারফত আসে সব একসঙ্গে টেবিলের উপরে নিয়ে রসময়বাবু সেগুলো দেখতে বসেন। ঠিক পৌনে দুটোয় তাঁর এই নির্বাচন আরম্ভ হয়।

এর আগে দেড়টা নাগাদ ভরপেট টিফিন খেয়ে নেন, গোটা-ছয়েক রাধাবল্লভি আর গোটা-চারেক সন্দেশ দিয়ে। জলখাবারের পর একটা হজমের ওষুধ খান আর সেইসঙ্গে একটা ঘুমের ওষুধের ট্যাবলেট।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে লেখা বাছাইয়ের এই পদ্ধতিটা রসময়বাবুর নিজের আবিষ্কার। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই জটিল নয়। ঘুমের নীল রঙের ট্যাবলেটটা খেলে প্রথমে ঝিমুনি এবং কিছু পরে ঘুম আসবেই। সেই ঘুমচোখে রসময় মজুমদার একের পর এক পড়তে থাকেন উঁকিঝুঁকি পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠানো যত রাজ্যের ছোট-বড়, খারাপ-ভাল গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী—এমনকী মোটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

রসময়বাবু লো ব্লাড প্রেশার অর্থাৎ নিম্ন রক্তচাপের রোগী। এই অসুখে সব সময়ে একটা ক্লান্তি, একটা ঝিমুনি, ঘুমঘুম ভাব থাকে। সেইসঙ্গে গুরুভোজন, হজমের ওষুধ এবং ঘুমের বড়ি সব মিলিয়ে ঘুমে

ঢুলতে ঢুলতে লেখাগুলি পড়তে থাকেন সম্পাদকমশায়। বলা বাহুল্য অবিলম্বে তাঁর চোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়, তাঁর হাত থেকে পাণ্ডুলিপি টেবিলের নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

যদি কোনওদিন এমন কোনও রচনা রসময়বাবুর হাতে পড়ে যে লেখা পড়তে পড়তে এত সব সত্ত্বেও তাঁর ঘুমঘুম ভাব কেটে যায়, যে লেখা রসময়বাবুকে জাগিয়ে রেখে পড়তে বাধ্য করে, অর্থাৎ, তাঁকে চোখ কচলিয়ে উঠে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পড়তে হয়, শুধু সেই রকম চাবুকের মতো লেখাই উঁকিঝুঁকির জন্যে নির্বাচন করেন রসময়বাবু।

বাকি সমস্ত লেখা অনিবার্যভাবে টেবিলের নীচে গড়ায় এবং সময়মতো উঁকিঝুঁকি পত্রিকার বুড়ো ঝাড়ুদার ঝড়ুলাল ঝাঁট দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই কাগজ দিয়ে উনুন ধরিয়ে দু'কাপ কড়া চা বানায়, এক কাপ নিজের জন্যে আর আর-এক কাপ সম্পাদকমশায়ের জন্যে। চা কড়া বানানোর জন্যে সেই চায়ের মধ্যে চিনি এবং দুধের বদলে শুকনো লঙ্কা পোড়ানো গুঁড়ো মিশিয়ে দেয়।

এই সাংঘাতিক চায়ে ধীরে-ধীরে চুমুক দিতে দিতে আস্তে-আস্তে চোখ খুলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন রসময়বাবু।

অধিকাংশ দিন প্রায় সমস্ত লেখাই ঘুম বিতাড়নে ব্যর্থ হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে উনুনে চলে যায়। তার মধ্যে দু-চারটে ভাল লেখাও নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু রসময়বাবু পরোয়া করেন না। তাঁর দুর্দান্ত পত্রিকা উঁকিঝুঁকির আলমারির মতো বড় ডাকবাক্স প্রতিদিন ভরে যায় হাজাররকম লেখায়। ঘুমুনোর মুখে যে দু-একটা লেখা বাছাই করে টেবিলে তুলে রাখেন তাতেই কাগজ রমরমা চলে।

আজকে কিন্তু একটা অঘটন ঘটল। দুটো-দশ নাগাদ ঘুমজড়িত চোখে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা একটা পদ্য মেঝেতে ফেলতে গিয়ে একটু থমকে গেলেন রসময়বাবু।

আরে, এ আবার এসব কী লিখেছে। সচরাচর এরকম লেখা তো তাঁর কাগজে আসে না। ঘুমের ঘোরে লেখাটা ফেলে দিতে গিয়ে একটু চোখ পড়াতেই বেশ জেগে উঠলেন রসময় মজুমদার। লেখাটা খুব বড় কিছু নয়, একটা রোগা চেহারার মাঝারি পদ্য। প্রথম কয়েক লাইনেই

pathagar.net

রীতিমত চিত্ত :

বাপ রে বাপ। চাপ রে চাপ।
নিম্নচাপ। উচ্চচাপ ॥
রক্তচাপ। চাপ রে চাপ।
বাপ রে বাপ। বাপ রে বাপ ॥

আগেই বলেছি সম্পাদক রসময় মজুমদারমশায় নিজে নিম্ন রক্তচাপের, লো প্রেশারের রোগী। রক্তচাপের উপরে আজব পদ্য পাঠ করে ঝপাং করে তাঁর ঘুমের রেশ কেটে গেল। তিনি সটান হয়ে বসে পদ্যটায় মনোনিবেশ করলেন।

পদ্যের নাম 'বাপ রে বাপ', কবির নাম রামশঙ্কর রায়চৌধুরী। কবির নামটা যেমন জাঁদরেল, ঠিক তেমনই জাঁদরেল কবিতাটি। তবে একটু পড়েই রসময়বাবু ধরতে পারলেন কবিতাটি শুধু রক্তচাপ নিয়ে লেখা নয়, আরও ভাল-ভাল জিনিস আছে এর মধ্যে। শেষের দিকে তো অসামান্য :

মাটন চাপ। চিকেন চাপ।
নেইকো পাপ। চায়ের কাপ ॥
রক্তচাপ। পাচ্ছে ভাপ।
বাপ রে বাপ। চাপ রে চাপ ॥

এর আগে অবশ্য কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে। কিন্তু পাকা সম্পাদক রসময় মজুমদারের ঝানু দৃষ্টিতে এটাও ধরা পড়ল যে, গোলমালটা চরম গোলমাল, কোনও সাধারণ কবি বা লেখক এ-ধরনের গোঁজামিলে যাবে না।

রসময়বাবু দু'বার পড়লেন গোলমেলে জায়গাটা, যত গোলমাল মনে হচ্ছে দু-চারবার পড়লে হয়তো সেটুকু মনে হবে না, বিশেষ করে একটা জায়গা তো এর মধ্যেই রীতিমত প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী মনে হচ্ছে।

জায়গাটা শেষের স্তবকের ঠিক একটু আগে রয়েছে। কবি রামশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন :

pathagar.net

করছে পাপ। কেউটে সাপ।
দিচ্ছে শাপ। ধর্মবাপ ॥
বাপ রে বাপ। দুঃখতাপ।
খুলছে খাপ। রক্তাপ ॥
নিম্নচাপ। ঊর্ধ্বচাপ।
বাপ রে বাপ। বাপ রে বাপ ॥

ঠিক এই জায়গায় রসময়বাবুর খেয়াল হয়েছিল কোথায় যেন একটু গোলমাল আছে। বাপ রে বাপ কবিতাটি তিনি দ্বিতীয়বার পড়ার সময় ধরতে পারলেন, প্রথম স্তবকে লেখা হয়েছিল 'নিম্নচাপ, উচ্চচাপ' আর পরে এখানে লেখা হয়েছে 'নিম্নচাপ, ঊর্ধ্বচাপ'। সাধারণত পোক্ত লেখকেরা এরকম করে না, তারা একটা কোনওরকম নিয়ম মেনে চলে। উচ্চ লিখলে উচ্চই লেখে, ঊর্ধ্ব লিখলে ঊর্ধ্বই। এর পরেই মজুমদার মহোদয়ের খেয়াল হল যাঁর লেখা তিনি এখন বিবেচনা করছেন তাঁর নাম সম্পূর্ণ অজানা। অর্থাৎ রসময় মজুমদার এই লেখকটিকে এই মুহূর্তে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। ইতিপূর্বে ইনি সম্ভবত আর কোথাও লেখেননি।

এদিকে উঁকিঝুঁকি পত্রিকার দেওয়ালঘড়িতে এখন প্রায় তিনটে বাজে। রসময়বাবু বাপ রে বাপ কবিতাটি টেবিলের উপরে কাঁচের কাগজচাপার নীচে আটকিয়ে বাকি সমস্ত লেখা টেবিলের নীচে ঢেলে দিয়ে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলেন।

[দুই]

উঁকিঝুঁকি

রসময় মজুমদারমশায় যতক্ষণ ঘুমোচ্ছেন, খুব সামান্য সময়, মাত্র একঘন্টার মতো, এর মধ্যে আমরা এই বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাটির সম্পর্কে একটু খবর নিয়ে নিচ্ছি।

pathagar.net

যে-কোনও অভিধান খুললে দেখা যাবে উঁকিঝুঁকি বানানে দুটো চন্দ্রবিন্দু, উ-এর মাথায় একটা আর ঝ-এর মাথায় একটা। কিন্তু উঁকিঝুঁকি কাগজের সব সংখ্যায় অভিধানের এই নিয়মটি মানা হয় না।

এদিকে রসময়বাবু যে একজন বিপ্লবী বানান-সংস্কারক তাও নন, তাঁর অসুবিধে অন্যত্র।

ভূতে বিশ্বাস করুক আর না করুক, ভূতের ভয় পাক বা না পাক, ভূতের উপর শ্রদ্ধা বা আস্থা থাকুক না থাকুক, পৃথিবীতে কোনও ভাষায় কোনও পত্রিকার কোনও সম্পাদক আজ পর্যন্ত ভূতের গল্প না ছেপে কাগজ চালাতে পারেননি। তার একটা কারণ ভদ্রসমাজে বলা যাবে না, কিন্তু উঁকিঝুঁকি কাগজের কথা লিখতে গিয়ে সে কথাটা না বললে বড় অন্যায় হবে।

কথাটা সামান্য কিন্তু বড় গুরুত্বপূর্ণ ; পৃথিবীর যে-কোনও কাগজের ক্রেতা এবং পাঠকের অধিকাংশই ভূত। সুতরাং ভূতদের অসন্তুষ্ট রেখে কোনও কাগজ কেউ চালাতে পারে না।

ফলে অন্যান্য কাগজের মতো উঁকিঝুঁকি পত্রিকাতেও প্রতি সংখ্যায় সম্ভব না হলেও মাঝেমধ্যেই ভূতের গল্প ছাপা হয়। তা ছাড়া বছরে অন্তত একটা বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা ছাপতেই হয়।

উঁকিঝুঁকি আশি পাতার কাগজ। প্রত্যেক পাতার নীচে উঁকিঝুঁকি এই নামটি সেইসঙ্গে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছাপা হয়। এতে আশি পাতায় একশো ষাটটা চন্দ্রবিন্দু লাগে। এর সঙ্গে যখন ভূতের গল্প যোগ হয় তখনই হয় প্রধান সমস্যা।

সবাই জানে যে ভূতেরা খোনা গলায় কথা বলে, আমরা বলি, 'কেমন আছ ?' ভূতেরা বলে 'কেঁমন আঁছ ?' ভূতেদের প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে অন্তত একটি চন্দ্রবিন্দু লাগে। এটা যে ভূতেরা মানুষদের ভয় দেখানোর জন্যে করে তা কিন্তু নয়, তারা নিজেদের মধ্যেও নাকি গলায় কথা বলে, চন্দ্রবিন্দু মাথায় না দিয়ে তাদের জিভ দিয়ে কোনও শব্দই বেরোতে পারে না।

সুতরাং ভূতের গল্পে চন্দ্রবিন্দু থাকবেই, বিশেষ করে সে গল্পে যদি অধিক মাত্রায় ভৌতিক কথোপকথন থাকে তবে তো বহু-বহু চন্দ্রবিন্দু

pathagar.net

লাগবে।

এইসব ক্ষেত্রে টান টান পড়ে যায় পত্রিকার উঁকিঝুঁকি নামের মধ্যে যে দুটো চন্দ্রবিন্দু আছে তার উপরে। ছাপাখানার সব চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করার পরে যদি আরও দরকার পড়ে তবে সে মাসে উঁকিঝুঁকি বানানে কোনও চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় না। আবার খুব বেশি দরকার না পড়লে, অর্থাৎ আশিটার মধ্যে হয়ে গেলে সেই সংখ্যায় উঁকি বানানে চন্দ্রবিন্দু থাকে, কিন্তু ঝুঁকি বানানে থাকে না।

ব্যাপারটা সোজাসুজি বলতে গেলে এইরকম। উঁকিঝুঁকি কাগজের সাধারণ সংখ্যায় দুটো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কাগজের নাম অভিধানসম্মত ছাপা হয়। কিন্তু বিশেষ ভৌতিক সংখ্যায় দুটো চন্দ্রবিন্দুই বাদ পড়ে যায়, কাগজের নাম তখন উকিঝুঁকি। আবার কোনও সংখ্যায় এক-আধটা ভূতের গল্প থাকলে তখন উকিঝুঁকি হয়ে যায়, শুধু প্রথমের চন্দ্রবিন্দু থাকে, শেষেরটা থাকে না।

চন্দ্রবিন্দুর প্রসঙ্গ আপাতত থাক। আমরা উঁকিঝুঁকির সম্পাদকীয় দপ্তরে ফিরে যাচ্ছি।

এতক্ষণে রসময়বাবুর ঘুম ভেঙেছে। এদিকে পাশের বারান্দার সিঁড়ির নীচে অমনোনীত রচনা দিয়ে উনুন জ্বালিয়ে ঝড়ুলাল-ঝাড়ুদারের লঙ্কা-চা বানানো প্রায় শেষ। আজকের শুকনো লঙ্কাটা বেশ চনমনে, পোড়ানোমাত্র তীব্র ঝাঁজে উঁকিঝুঁকি অফিস আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দপ্তরিবাবু, প্রফুরিডারবাবু, কেরানিবাবু সবাই প্রাত্যহিক অভ্যাসবশত নাকে রুমাল চাপা দিলেন। তবে এক-একদিন নাকে রুমাল চাপা দিলেও সমস্যার সমধান হয় না তখন সবাই অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের রাস্তায় দাঁড়ান। কোনও-কোনও দিন এমন হয় যে, হাঁচতে-হাঁচতে কাশতে-কাশতে সম্পাদক রসময়বাবু পর্যন্ত সেই মারাত্মক চায়ের পেয়ালা হাতে রাস্তায় বেরিয়ে যান।

আজও তাই হল। আজ সমস্ত ঘর যেমন ঝাঁজে ভরে গেছে, তেমনিই ঝাঁজ চায়ের পেয়ালায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রসময়বাবুর সেই ঘুমের আগে পড়া বাপ রে বাপ কবিতাটার

কথা মনে পড়ল। তখনই তাঁর খেয়াল হল—সর্বনাশ, চায়ে যা ঝাঁজ, কাগজের ধোঁয়ায় যা ঝাঁজ, বোকা ঝাড়ুদারটা সেই কবিতাটা পুড়িয়ে চা বানাল নাকি ?

ঝড়ুলাল-ঝাড়ুদার অবশ্য এমন কাঁচা কাজ কখনও করে না। টেবিলের উপরের কাগজ সে কখনও ছোঁয় না তার কাজ টেবিলের নীচে ঢেলে দেওয়া বাতিল, অমনোনীত গল্প, উপন্যাস, কবিতা দিয়ে।

যেদিন উনুন ধরানোর কাগজে কবিতার পরিমাণ বেশি থাকে সেদিন চায়ের স্বাদ খুব জমজমাট হয়। আজ কি একটা বিতিকিচ্ছিরি লেখা ছিল তাই এত ঝাঁজ ! এরকম ধারণা অবশ্য রসময়বাবুর নিজের, শুকনো লঙ্কা পোড়াই যে এজন্যে দায়ী তিনি সেটা মানেন না। ঝড়ুলালও সেটা মানে না।

সে যা হোক, হাঁচতে-হাঁচতে কাশতে-কাশতে তাঁর নিজের দপ্তরে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন সম্পাদকমশায়। ভাগ্য ভাল, কবিতাটা টেবিলের উপরেই রয়েছে, নীচে পড়ে ভস্মীভূত হয়নি।

চেয়ারে বসে বাপ রে বাপ কবিতাটি হাতে তুলে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে আর-একবার পড়লেন রসময়বাবু। খুব চমৎকার। এমন কবিতা বেশিদিন ধরে রাখা বোধহয় উচিত হবে না। কবিরা, বিশেষ করে নতুন কবিরা, খুব খামখেয়ালি হয়। ছাপতে দেরি হচ্ছে দেখে দেবে অন্য কোনও কাগজে পাঠিয়ে। শেষে হয়তো দেখা যাবে, একই কবিতা দু'কাগজে একসঙ্গে বেরিয়েছে। উঁকিঝুঁকি পত্রিকার পক্ষে এ-রকম ব্যাপার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এদিকে সমস্যাটা হল এই যে, সামনের সংখ্যাই নববর্ষ সংখ্যা, সেটাই বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা হিসেবে বেরোচ্ছে। সে সংখ্যার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। কিন্তু যতই চমকপ্রদ হোক, বাপ রে বাপ কবিতা তো আর ভৌতিক সংখ্যায় দেওয়া যায় না। এর মধ্যে ভূতের ব্যাপার কই ?

এই রকম সব জটিল মুহূর্তে রসময়বাবু হরিলালের পরামর্শ নেন। ছোকরা খুব তালেবর। প্রুফ দেখা থেকে বিজ্ঞাপনের টাকা আদায়, উঁকিঝুঁকির প্রায় সব কাজই সে দেখাশোনা করে। নিজে এক লাইন

pathagar.net

তুমি জানোনা এ-সংখ্যা ভৌতিক সংখ্যা?

pathagar.net

লেখে না কিন্তু লেখার ব্যাপারটা ভাল বোঝে। হরিলালের জীবনে একমাত্র স্বপ্ন হল রসময়বাবুর পরে উঁকিঝুঁকি কাগজের সম্পাদক হওয়া। হরিলালের কাজকর্মে রসময়বাবু মোটামুটি খুশি। সামনের বছর থেকে তিনি তাকে সহকারী সম্পাদক করে দেবেন মনস্থ করেছেন।

আজ হরিলালকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে কবিতাটি দেখালেন। বাপ রে বাপ পড়ে হরিলাল রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল, বলল, "স্যার, এটা এই সংখ্যাতেই ছাপানো হোক।"

রসময়বাবু ভ্রূ কুঞ্চন করে বললেন, "তুমি জানো না, এ-সংখ্যা ভৌতিক সংখ্যা ? এ-সংখ্যায় এ কবিতা ঢোকালে গোঁজামিল হয়ে যাবে না ?"

হরিলাল বলল, "সেসব ভাববেন না স্যার, দিন, কবিতাটা আমাকে দিন।" তারপর কবিতাটা হাতে তুলে নিয়ে বুক-পকেট থেকে একটা পেনসিল বার করে, কবিতার নামটা বাপ রে বাপ কেটে দিয়ে সেখানে তার নিজের গোটা-গোটা মুক্তোর মতো অক্ষরে লিখল, 'মামদোর পদ্য'। তারপরে পদ্যের মধ্যে একের পর এক শব্দের মাথায় পেনসিল দিয়ে চন্দ্রবিন্দু বসাতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মামদোর পদ্যে এক অভাবনীয় খোলতাই ভাব দেখা দিল। মুগ্ধ হয়ে রসময়বাবু হরিলালের এই অসামান্য সম্পাদনা দেখতে লাগলেন :

বাঁপ রে বাঁপ। চাঁপ রে চাঁপ।
মঁটন চাঁপ। চিঁকেন চাঁপ।
নেঁইকো পাঁপ। চাঁয়ের কাঁপ।

হরিলালের পাকা হাতের ছোঁয়ায় এবার পদ্যটি একেবারে ঝলমল করছে। খুব খুশি হলেন রসময়বাবু।

pathagar.net

[তিন]

মামদোর পদ্য

যথাসময়ে যথাস্থানে মামদোর পদ্য প্রকাশিত হল। বলা বাহুল্য, এ-ক্ষেত্রে যথাস্থান হল একদম প্রথম পৃষ্ঠায়। 'উঁকিঝুঁকি' ভৌতিক সংখ্যা আরম্ভই হল মামদোর পদ্য দিয়ে। যথারীতি চন্দ্রবিন্দুর অভাবে ভৌতিক সংখ্যায় পত্রিকার নাম চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে নিতান্ত উঁকিঝুঁকি ছাপা হল। কারণ প্রতি পাতায় উঁকিঝুঁকি বানানে চন্দ্রবিন্দু যোগান সম্ভব নয়।

কখনও কখনও পাঠক বা সমালোচকেরা পত্রিকার নামের বানানের এমন বিচিত্র ও অদ্ভুত ব্যবহার দেখে নিন্দেমন্দ যে করে না তা নয়, কিন্তু রসময়বাবুকে হরিলাল বোঝায় যে, "ও সব ছেঁদো কথা বাদ দিন। উঁকিঝুঁকি থেকে চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়ায় নামটার মধ্যে কেমন ছাড়া-ছাড়া, ভুতুরে ভাব, অক্ষরগুলোর মধ্যে একটা পোড়োবাড়ি চেহারা আসে। ভৌতিক সংখ্যা এরকমই তো হওয়া উচিত। পারবে আর কোনও সম্পাদক এরকম করতে ?"

হরিলালের আশ্বাসে কিছুটা কাজ হয়। রসময়বাবু প্রাচীন যুগের লোক। বানান-টানান নিয়ে খুব বেশি স্বাধীনতা তাঁর পছন্দ নয়।

কিন্তু রসময়বাবু যা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি, চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া নিয়ে নয়, তাঁকে বিপদে পড়তে হল চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করার জন্যে।

সে হল ওই বাপ রে বাপ কবিতায় চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নিয়ে। ভৌতিক সংখ্যা যেদিন সকালে বেরিয়েছে সেদিনই দুপুরে ঘটনাটা ঘটল।

বেলা তখন আড়াইটে। পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে এবং মেঝেতে ফেলতে ফেলতে রসময়বাবু গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন তাঁর স্বভাবোচিত দিবানিদ্রায়। এমন সময় তাঁরা এলেন।

তাঁরা মানে কবি রামশঙ্কর রায়চৌধুরী। যিনি ওই অত্যাশ্চর্য বাপ রে বাপ কবিতার লেখক ! রামশঙ্কর রায়চৌধুরী শুধু কবি নন, তিনি পাগলের ডাক্তার। যেমন জাঁদরেল তেমনিই বিপজ্জনক চেহারা তাঁর।

বৃদ্ধ আক্রমনকারী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দাঁড় করিয়ে ফেললেন...

pathagar.net

রামশঙ্করবাবুর সঙ্গে এসেছেন তাঁর প্রাণের বন্ধু কবি হরগোবিন্দ পাল। বলা বাহুল্য দু'জনেরই যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিন্তু গাট্টাগোট্টা, পালোয়ানি চেহারা। তবে রামশঙ্করবাবুর গোঁফ আছে যা হরগোবিন্দর নেই।

সে যা হোক, বেলা আড়াইটে নাগাদ পত্রিকা দপ্তরে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধ অথচ বলবান কবিদ্বয়।

তখন ঝড়ুলাল-ঝাড়ুদার রসময়বাবু টেবিলের নীচে থেকে সন্তর্পণে পরিত্যক্ত, অমনোনীত রচনাগুলি কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলছে। খুব নিঃশব্দে তাকে এই কাজ করতে হচ্ছে, যাতে কোনওমতেই সম্পাদক মহোদয়ের ঘুমের একটুও ব্যাঘাত না হয়।

পাশের ঘরে অফিসের অন্য লোকেরা কাজ করছে। তার মধ্যে হরিলালও রয়েছে। হরিলাল আগামী সংখ্যার সূচীপত্র সাজাচ্ছিল, একটা লেখা রয়েছে 'নিজের ছাদে নিজের পাট চাষ করো', লেখাটি প্রবন্ধের মধ্যে যাবে, না, রম্যরচনা হিসেবে যাবে। তাই নিয়ে তার মনে খটকা লেগেছে। সে লেখাটা পড়ে দেখছিল।

চমৎকার লেখা, একটা পরিবারের বছরে নিজেদের ব্যবহারের জন্যে কেজি-দুয়েক পাট লাগে, দড়ি বানাবার জন্যে। ঘর মোছার ন্যাতার জন্যে এবং আরও নানা কাজে। এই পাটটুকু অনায়াসেই যে যার ছাদে বা বারান্দায় দশ পনেরোটা টবে চাষ করতে পারে। ফলে সারা বছরের পাটের খরচা বেঁচে যায়।

তা ছাড়া কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায় তার শুধু শুধু এই সামান্য কারণে দড়ি কেনার জন্যে পয়সা নষ্ট করার দরকার নেই। মাত্র চার-পাঁচ মাসের সামান্য পরিশ্রমে সে অনায়াসেই গলায় দেওয়ার মতো দড়ির উপযুক্ত পাট নিজের ছাদেই টব বসিয়ে চাষ করতে পারবে।

এই রোমহর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে হরিলাল যখন বিহ্বল ও চমৎকৃত, ঝড়ুলাল যখন টেবিলের নীচে থেকে পাণ্ডুলিপি আহরণ করছে তখনই দুম-দুম করতে করতে রামশঙ্কর এবং হরগোবিন্দ প্রবেশ করলেন। রামশঙ্করের হাতে শক্ত বাঁশের বাঁটের ছাতা, হরগোবিন্দর হাতে মোটা

pathagar.net

বেতের লাঠি।

সদর রাস্তা থেকে একটা প্যাসেজ দিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি অফিসে ঢুকতে হয়। ঢুকেই একটা ছোট বারান্দামতো জায়গা। সেখানে একটা পুরনো আমলের লোহার চেয়ার আর কেরোসিন কাঠের শস্তা টেবিল। টেবিলের অন্য পাশে একটা মাটির উনুন, চায়ের কাপ-প্লেট, কেটলি ইত্যাদি। এই ছোট জায়গাটা হল এই কাগজের ঝাড়ুদার তথা বেয়ারা তথা পিয়ন তথা দারোয়ান ঝড়ুলালের দপ্তর। আর ওই উনুনেই উঁকিঝুঁকি সম্পাদকের ভয়াবহ ঝাল-চা প্রস্তুত হয়।

ঝড়ুলালের বারান্দার পরে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা বড়, সেটা উঁকিঝুঁকি কাগজের অফিস। সেখানে হরিলাল এবং পত্রিকার অন্য কর্মচারীরা বসে। আর ছোট ঘরটা খোদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রসময় মজুমদারের।

ছাতা হাতে রামশঙ্করবাবু এবং লাঠি হাতে হরগোবিন্দবাবু উঁকিঝুঁকি দপ্তরে ঢুকে সামনের বারান্দায় কাউকে না পেয়ে প্রথমে মাটির উনুনটা আক্রমণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেটা গুঁড়ো হয়ে গেল। তারপর হরগোবিন্দবাবু তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে চায়ের কাপ-প্লেট ভাঙতে লাগলেন আর অ্যালুমিনিয়ামের কেটলিটাকে ছাতাপেটা করতে লাগলেন রামশঙ্করবাবু।

উঁকিঝুঁকি পত্রিকার দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরের ইতিহাসে এমন দুর্দৈব আর কখনও ঘটেনি। লেখাটেখা ছাপা না হলে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ এসে রাগারাগি, চেঁচামেচি করে না তা নয়। এই তো গত সপ্তাহেই হালিশহর থেকে একজন পাগল এসেছিল, তার ধারণা যে সে-ই উঁকিঝুঁকি কাগজের মালিক। সে খুব ঠেলাঠেলি করেছিল রসময়বাবুকে সম্পাদকের চেয়ার পরিত্যাগ করে চলে যেতে কিন্তু সেদিন ঝড়ুলাল একাই সে পাগলের মোকাবিলা করেছিল এবং তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে গলির মোড় পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসে।

কিন্তু আজ ঝড়ুলাল, হরিলাল কিংবা অন্য কেউ কিছু করবার আগেই দুই বৃদ্ধ আক্রমণকারী এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দাঁড় করিয়ে ফেললেন যে সবাই কেন, কী, কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে থরথর করে কাঁপতে

লাগল।

ঝড়ুলাল রসময়বাবুর টেবিলের নীচে থেকে কাগজ কুড়োচ্ছিল। সে অবস্থা বুঝে সেখানেই বসে রইল আর বাইরে এল না। এদিকে রসময়বাবু ঘুম ভেঙে হঠাৎ কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে বুঝতে না পেরে, 'হরিলাল, ঝড়ুলাল', বলে চেঁচাতে লাগলেন।

ততক্ষণে বড় অফিস ঘরটায় বুড়ো দু'জন ঢুকে পড়েছেন। ঢুকেই ছাতা উঁচিয়ে রামশঙ্কর রায়চৌধুরী নাকি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁর নাঁম রঁসময় মঁজুমদার ?"

চন্দ্রবিন্দুশোভিত এই প্রশ্ন শুনে চতুর হরিলাল মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল এই বুড়ো ওই বাপ রে বাপ কবিতার লেখক, যার সব শব্দে চন্দ্রবিন্দু লাগানো হয়েছে। সেইসঙ্গে হরিলালের এটাও মনে পড়ল যে চন্দ্রবিন্দুগুলো তারই লাগানো, তা ছাড়া কবিতার নাম বাপ রে বাপ থেকে বদলে মামদোর পদ্য সে-ই করেছিল।

ভয়ে হরিলালের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সে বাক্যরহিত হয়ে বুড়ো দু'জনের তাণ্ডবনৃত্য দেখতে লাগল।

[চার]

লিখে যা রে যা লিখে

উঁকিঝুঁকি কাগজের অবস্থা এখন ভারী বেসামাল।

ঝড়ুলাল সম্পাদকের টেবিলের নীচে লুকিয়ে, হরিলাল ভয়ে থম মেরে গেছে। উঁকিঝুঁকি কাগজের বাকি লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বুড়ো দু'জন বড় ঘরের মধ্যে বোঁ-বোঁ করে ছাতা এবং লাঠি ঘোরাচ্ছে। এই রকম মিনিট-দুয়েক চলল।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়েছে। কালো রঙের রাস্তার একটা কুকুর, তাকে ঝড়ুলাল 'কালিয়া' বলে ডাকে এবং দু'বেলা দুটো রুটি দেয়। সেই কুকুরটা সময়ে-অসময়ে পাশের প্যাসেজে ছায়ায় শুয়ে ঘুমোয়। সে হঠাৎ এত গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে উঠে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে উঁকিঝুঁকি

অফিসে প্রবেশ করল এবং সামনে ভীষণদর্শন, অগ্নিমূর্তি দুই বৃদ্ধকে দেখে তার যোগ্যতা ও বুদ্ধিমতো তেড়ে গেল।

খেঁকি কুকুরের তেড়ে যাওয়া ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। তেড়ে যায় কিন্তু কিছুতেই কামড়ায় না। দেড়ফুট নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে শত্রুর উদ্দেশে দাঁত খিঁচোতে থাকে। সেটাও অবশ্য কম কিছু নয়। খেঁকি কুকুরের দাঁত-খিঁচানোর মতো বীভৎস ব্যাপার পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

বাপ রে বাপ কবিতার লেখক রামশঙ্কর রায়চৌধুরী কিন্তু এত সহজে ভয় পান না। তিনি হাতের ছাতাটা দিয়ে কালো কুকুরটাকে থেঁতলে দিতে পারতেন এক মুহূর্তে, কিন্তু কেমন মায়া হল তাঁর। অনেকদিন আগে তাঁদের হাজরা রোডের বাড়ির দরজায় এমন একটা কালো কুকুর প্রত্যেকদিন তাঁকে দেখে লেজ নেড়ে কোল বেয়ে উঠে দাঁড়াত। তিনি কোনওদিন তাকে আধখানা বিস্কুটও দেননি। শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'কী রে কেষ্টা, কেমন আছিস ?'

কুকুরটাকে পেটানোর জন্যে ছাতা তুলেছিলেন রামশঙ্কর, হঠাৎ পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কেষ্টা কুকুরটার কথা মনে হল। ভাল করে নজর করে দেখলেন। এই তো সেই কেষ্টা, এতদিন পরে এখানে কী করে এল !

কিছু না বুঝে রামশঙ্করবাবু হঠাৎ ডান হাত থেকে ছাতাটা ফেলে দিলেন, তারপর হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁত-বার-করা কুকুরটার মাথার উপরে তুলে আলতো গলায় বললেন, "কী রে কেষ্টা, এত রাগ কেন, এখানে এতদিন পরে কোথা থেকে এলি ?"

কালিয়া কিংবা কেষ্টা কী বুঝল কে জানে ? হঠাৎ সে দাঁত-খিঁচোনো থামিয়ে তার খাড়া হয়ে দাঁড়ানো লেজটাকে নাড়তে নাড়তে সামনের দুটো পা তুলে রামশঙ্করের বুক বরাবর দাঁড়িয়ে গেল, বুকে মুখ গুঁজে কুঁ-কুঁ করতে লাগল।

কেষ্টার এই নরম ব্যবহারে রামশঙ্করবাবুরও সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহার বদলে গেল। তিনি তাণ্ডবনৃত্য ও ভৌতিক চিৎকার বন্ধ করে কুকুরটার মাথায় পিঠে আলতো করে হাত বুলোতে লাগলেন।

pathagar.net

হরগোবিন্দবাবু কিন্তু এত সহজে প্রশমিত হওয়ার লোক নন। তাঁর অবশ্য কোনও ক্ষতি করেনি উঁকিঝুঁকি কাগজ, কিন্তু তাঁর প্রাণের বন্ধু রামশঙ্করের অমন চমৎকার কবিতাকে মামদোর পদ্য বলে ছেপেছে, সেই রাগে তিনি তখনও মোটা বেতের লাঠিটা বাঁই-বাঁই করে ঘোরাচ্ছেন, আর মুখে বলছেন :

ওরে ওরে রসময় !
আজ তোর অসময় !
ওরে ওরে রসময় !
আজ তোর নয়-ছয় !

কালো কুকুরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রামশঙ্কর হরগোবিন্দের এই দুঃখজনক উত্তেজিত অবস্থা দেখে বললেন, "হরে, উঁকিঝুঁকি কাগজ আমাকে মামদো বলেছে, তোকে তো বলিনি। তুই খেপছিস কেন, বরং আমাদের কেষ্টাকে দ্যাখ।"

কেষ্টা মানে সেই রাস্তার কালো কুকুরটা তখন চিত হয়ে শুয়ে শূন্যে চার পা তুলে রামশঙ্করবাবুকে তার আকুতি নিবেদন করছে।

এই দৃশ্য দেখে হরগোবিন্দবাবু দুঃখিত হলেন কি সুখী হলেন সেটা অবিলম্বে বোঝা গেল না। তবে তিনি একটা কাজ করে বসলেন। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে চিত হয়ে শুয়ে পড়া কুকুরটার দিকে হাত প্রসারিত করে স্বভাবসিদ্ধ কাব্যিক ভাষায় বলে উঠলেন :

ওরে ওরে কেষ্টা,
এত বড় দেশটা,
তুই কিনা শেষটা
ছেড়ে দিলি চেষ্টা।
লিখে যারে যা লিখে,
কাক বক শালিখে
যা বলে তা বলবে,
তোর লেখা চলবে।
মামদোর পদ্য।

pathagar.net

পাতাভরা গদ্য
চার হাতে যা লিখে,
কাক বক শালিখে
যা বলে তা বলবে
তোর লেখা চলবে।
ওরে ওরে কেষ্টা
ছাড়িস না চেষ্টা।

কবিতাটি গানের সুরে গাইতে গাইতে হরগোবিন্দবাবুর মনের ভাবও অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে তাঁর সম্পাদকীয় কক্ষ থেকে রসময়বাবু এই বড় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর পিছনে ঝড়ুলাল লুকিয়ে অবস্থা উঁকি দিয়ে দেখছে আর রসময়বাবুকে ফিসফিস করে সাবধান করছে, "বড়বাবু, আর নয়, আর এগোবেন না, একদম ছাতাপেটা করে দেবে।"

কিন্তু ঘটনার গতি ইতিমধ্যে একটি সামান্য কারণে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ওই যে একটুক্ষণ আগের কবিতায় হরগোবিন্দ মামদোর পদ্যের কথা বলেছেন, যেখানে কেষ্টাকে বলেছেন, 'মামদোর পদ্য...চার হাতে যা লিখে।' কেষ্টা তো আর মামদোর পদ্য লেখেনি, সেটা লিখেছেন রামশঙ্কর স্বয়ং এবং সেটা তিনি চার হাতে লেখেননি, এক হাতে লিখেছেন, নিজের অব্যর্থ এবং অমোঘ ডান হাতে।

সব জেনেশুনে কেষ্টা কুকুরটার সঙ্গে প্রাণের বন্ধু এবং সহকবি হরগোবিন্দ তাঁর তুলনা করলেন এবং সেটা তিনি স্বকর্ণে শুনলেন। এর ফলে রামশঙ্কর আবার প্রবল উত্তেজিত হয়ে ফেলে-দেওয়া ছাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার মাথার ওপর বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন। কেষ্টা কুকুরটা চিত হয়ে শুয়ে শূন্যে চার পা তুলে লেজ নাড়াচ্ছিল। সে বেগতিক দেখে চট করে লাফিয়ে সোজা হয়ে উঠে ফের ঘেউ-ঘেউ শুরু করে দিল। হরগোবিন্দবাবু রসময়বাবু এবং ঘরের অন্যান্য ব্যক্তিরাও যথাসাধ্য নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে রামশঙ্করবাবুর ছাতাবাজি পর্যবেক্ষণ

করতে লাগলেন।

কিন্তু একটু পরেই রসময়বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উঁকিঝুঁকির মতো বিখ্যাত কাগজের অফিসে এ জিনিস বেশিক্ষণ চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এর মধ্যে যদি কোনও পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা নিদেনপক্ষে কোনও হকার বা বিজ্ঞাপনদাতা এসে এই দৃশ্য দ্যাখে, সেটা পত্রিকার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক হবে না।

রসময়বাবু বুদ্ধিমান্ লোক। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সহজ-সরল পথে এ উন্মাদ কবিকে ছাতানৃত্য থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে না। তিনি ঘেউ-ঘেউরত কুকুরটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললেন, "ও মশায়, ছাতা ঘোরানো থামান। কুকুর কামড়ে দেবে যে।"

ছাতা ঘোরানোর বেগ একটু কমতে দেখে রসময়বাবু বললেন, "ছাতা নামান, ছাতা নামান। একবার যদি কুকুর কামড়ে দেয় সাক্ষাৎ জলাতঙ্ক রোগ হবে, তখন একশো একুশটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে, না হলে সাক্ষাৎ মৃত্যু।"

ভয় দেখানোর জন্যে একুশটা ইঞ্জেকশনের মাত্রা বাড়িয়ে একশো একুশটা একটু বেশি হয়ে গেল, কিন্তু একই বাক্যে কাছাকাছি দু'বার 'সাক্ষাৎ' শব্দটি ব্যবহার করতে পেরে রসময়বাবু সম্পাদক-মনটি একটু খুশি হল।

জলাতঙ্ক রোগের ভয়েই হোক অথবা কুকুরের ঘেউ-ঘেউয়ের জন্যেই হোক কিংবা ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্যেই বোধহয় রামশঙ্করবাবুর মাথার উপর থেকে ছাতা নামালেন।

রামশঙ্করের মনটাকে খুশি করার এবং তাঁর সঙ্গে যে কেষ্টা কুকুরের তুলনা দেওয়া হয়েছিল সেটা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে হরগোবিন্দবাবু হঠাৎ প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বন্ধুকে বললেন, "আচ্ছা রাম, তুই সেদিন একটা কবিতা লিখলি না জলাতঙ্কের উপরে?"

pathagar.net

[পাঁচ]

জলাতঙ্ক

ভগবানের আশীর্বাদে কবি রামশঙ্কর রায়চৌধুরী কিংবা তাঁর বন্ধু কবি হরগোবিন্দ পাল মশায়ের কবিতা লেখার জন্যে কোনও কষ্ট করতে হয় না।

কথায় আছে, 'কাগজ-কলম-মন, লেখে তিনজন'। কিন্তু রায়চৌধুরীমশায় বা পালমশায়ের কবিতা লেখার ব্যাপারে ওই মনের ব্যাপারটা গৌণ। তাঁদের মনের মধ্যে সদাসর্বদা কবিতা গিজগিজ করছে। কাগজ আর কলম থাকলেই হল, তাঁরা ইচ্ছে করলে পাতার পর পাতা খসখস করে কবিতা লিখে যেতে পারেন। বিষয় নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই, এই তো সেদিন কবি হরগোবিন্দ পাল সকালবেলা বাজার থেকে ফিরে এসে, বাজারের থলেটা নামিয়েই কবিতা লিখতে বসে গেলেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বাজারে একটা লোক ফুলকপি কিনতে গিয়ে বলে আদ্ধেক নেব। দোকানদার রাজি নয়। দোকানদারের বক্তব্য, কখনও কোথাও ফুলকপি কেটে বা ভাগ করে বেচা হয় না।

কিন্তু সে-লোকটা ছাড়বে না। সে বলছে, লাউ, কুমড়ো এঁচোড়, ওল, কচু এমনকী বাঁধাকপি যদি কেটে বেচা যায় তবে ফুলকপি কেন আদ্ধেক করে বেচা যাবে না!

রীতিমত গোলমাল। গোলমালের শেষটা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল সেটা দেখার জন্যে হরগোবিন্দবাবু আর অপেক্ষা করতে পারেননি। কারণ এই ঘটনায় তাঁর মাথার মধ্যে পদ্যের পোকা কিলবিল করা শুরু করে দেয়। বাসায় ফিরে এসেই কপালের ঘাম না মুছে একটা পেনসিল নিয়ে বাজারের ফর্দের উলটো দিকে তরিতরকারি এবং সেইসঙ্গে একটু আগে বাজারের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনবদ্যভাবে লিখে ফেললেন—

বেগুন পটল ফুলকপি।
কেউ কেউ চায় হাফ কপি ॥

pathagar.net

টমাটো গাজর বরবটি।
কেউ কেউ বড় নটখটি ॥
কুমড়ো এঁচোড় সাদা আঠা।
কলমি পালং লাউ-ঢেঁড়স ॥
হাফ যদি হয় বাঁধাকপি।
হবে না কি ফুল হাফ কপি ?

সেদিন প্রশ্নবোধক চিহ্নে কবিতাটি শেষ করতে পেরে মনে বড় আনন্দ হয়েছিল কবি হরগোবিন্দ পালের।

কিন্তু এদিক থেকে বাপ রে বাপ ওরফে মামদোর পদ্যে রচয়িতা রামশঙ্কর রায়চৌধুরী আরও এককাঠি ওপরে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ পাগলের ডাক্তার তিনি, তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি হাজার রকম বিচিত্র ঘটনায় ভর্তি। তাঁর ধারণা শুধু মানুষ বা কুকুর-বেড়াল নয়, সব রকমের জীবজন্তু, পাখি, মাছ, এমনকী যন্ত্রপাতি, ছাতা-কলম-টর্চলাইট, সব কিছুই পাগল হতে পারে, পাগল হয়। সব সময়ে খুব একটা চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। পাগলামির প্রথম পর্যায়ে একটু মৃদু তোয়াজে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

রামশঙ্করবাবুর একটি আদ্যিকালের অতি পুরনো পেতলের টর্চ আছে। সেটা একটু গোলমেলে, তার সুইচটা মোটেই ভাল নয়। প্রায়ই ঝাঁকি দিয়ে জ্বালাতে হয়, অনেক সময় ঝাঁকি দিলেও জ্বলে না।

কিন্তু রামশঙ্করবাবু এখন কিছুদিন হল খুব বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁর টর্চলাইটটাকে বাগে এনেছেন। সেটাকে খুশি রাখার জন্যে উনি সেটার নাম দিয়েছেন 'আলোকদেবতা'। আর আলোকদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তিনি একটা সুরেলা মন্ত্র রচনা করেছেন। সেই মন্ত্রের প্রথম শ্লোকটি হল :

জাগো,
আলোকদেবতা জাগো।
ভাগো,
আঁধার-দৈত্য ভাগো ॥

pathagar.net

আজকাল টর্চটি না জ্বললে এই মন্ত্রটি গানের সুরে আওড়াতে আওড়াতে রামশঙ্কর টর্চটাকে ঝাঁকাতে থাকেন। দেবতা প্রসন্ন হলে কখনও সঙ্গে-সঙ্গে, কখনও কিছু দেরিতে আলো টর্চের মধ্য থেকে বেরোয়।

শুধু টর্চলাইট নয়। রামশঙ্করবাবুর হাতঘড়িটাও মন্ত্রের শাসনে বাধ্য।

হাতঘড়িটা পুরনো। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বিয়েতে যৌতুক পেয়েছিলেন রায়চৌধুরীমশায়। ঘড়িটা কয়েক বছর ধরে বড় বেশি ফাস্ট যাচ্ছিল। ঘন্টায় দশ-পনেরো মিটিন, মানে দিনে প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা ফাস্ট। এ ঘড়ি হাতে দেওয়া না দেওয়া সমান।

বড় দোকান থেকে প্রিয় ঘড়িটা অন্তত দু'তিনবার রামশঙ্করবাবু সারিয়েছেন। রীতিমত পয়সা খরচ করে অয়েল করিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ কোনও লাভ হয়নি, দু'চার সপ্তাহ পরে আবার যে-কে-সেই, দিনে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে।

পুরনো বিলিতি কোম্পানির ঘড়ি। কোম্পানিটা এদেশ থেকে অনেকদিন আগে উঠে গেছে। খোদ লন্ডনে ওই কোম্পানির হেড অফিস। রামশঙ্করবাবুর ভাগ্নে লন্ডনে গিয়েছিল একটা ব্যবসার কাজে, সে যাওয়ার সময় বলল, "মামা, তোমার ঘড়িটা দাও। পুরনো আমলের সোনার ঘড়ি। আজকাল আর দেখাই যায় না। দেখি লন্ডন থেকে সারিয়ে আনতে পারি কি না।"

ভাগ্নের ওপর খুব যে একটা আস্থা আছে রামশঙ্করবাবুর, তা নয়। আসলে সারাজীবন পাগল দেখে-দেখে তাঁর সবরকম মানুষজনের ওপরেই আস্থা কম।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি ঘড়ির জন্যে একটি সুললিত মন্ত্র রচনা করলেন। করে একশো আটবার, ঘড়িটা হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে, ঘড়ির বিলেত যাওয়ার মন্ত্র আওড়ালেন :

যাও ঘড়ি। যাও ঘড়ি।
আপনাকে ঠিক করি,
ফিরে এসো তড়িঘড়ি।

pathagar.net

জয় হরি। জয় হরি।

এর সঙ্গে 'পড়িমরি' মিল দিয়ে রামশঙ্করবাবু মন্ত্রটা আরেকটু বাড়াতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না। ভেবে দেখলেন, তা হলে শ্লোকটা খেলো হয়ে যাবে। মন্ত্রের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, সপ্তাহ ছয়েক পরে ভাগ্নেটি লন্ডন থেকে ঘড়িটি সারিয়ে নিয়ে ফিরল। চমৎকার চলছে ঘড়িটি এখন। তবে রামশঙ্করবাবু মনে-মনে ভাল করেই জানেন, বিলিতি মেরামতি-টেরামতি আসল কথা নয়, ঘড়িটা ভাল হয়েছে তাঁর সৃষ্ট মন্ত্রের জোরে।

এহেন রামশঙ্করবাবু জলাতঙ্কের বিষয়ে পদ্য বা কবিতা লিখবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী থাকতে পারে। শুধু জলাতঙ্ক নয়, কলেরা, টাইফয়েড এমনকী পাতাল রেল, জুতোর বাক্স, হ্যালির ধূমকেতু ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে তাঁর অনায়াস দক্ষতা।

অনেক সময় সব কিছু একসঙ্গে মিলিয়ে চমৎকার কবিতা লেখেন রামশঙ্কর রায়চৌধুরী, যেমন লিখেছিলেন ওই আশ্চর্য বাপ রে বাপ কবিতা, যেটা মামদোর পদ্য নামে উঁকিঝুঁকি কাগজের 'নববর্ষ, বিশেষ ভৌতিক সংখ্যায়' প্রকাশিত হয়েছে এবং যা নিয়ে এত গোলমাল।

[ছয়]

গোলমালের পরে ও আগে

মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে উঁকিঝুঁকি কাগজের অফিসে রামশঙ্করবাবু এবং তাঁর বন্ধু হরগোবিন্দবাবু যে পরিমাণ গোলমাল করেছেন, সে তুলনায় আসল ক্ষতি কিন্তু খুব কমই করেছেন।

যেটুকু ক্ষতি হয়েছে সে হল চায়ের জিনিসপত্রের। মাটির উনুনটা একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে, চায়ের কাপ-প্লেট-কেটলি যা-কিছু লাঠির ডগায় কিংবা ছাতার নাগালে পেয়েছেন তাই চুরমার করেছেন দুই বন্ধুতে। কেটলিটা অ্যালুমিনিয়ামের হওয়ায় সেটা ভাঙেনি, কিন্তু একেবারে তুবড়ে

গেছে।

দুই রাগী কবির উত্তেজনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হতে ঝড়ুলাল ঝাড়ুদারের মাথায় চিন্তা ঢুকল আজকের চা কী করে হবে।

ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প, মহামারী যাই হোক না কেন, প্রতিদিন মধ্যাহ্ন নিদ্রার পরে সম্পাদক রসময় মজুমদারের অবশ্য-অবশ্য চাই প্রিয় ঝড়ুলালের হাতে তৈরি এক পেয়ালা ঝাল, ঝাঁঝালো চা।

ঝড়ুলাল খুব নির্বোধ লোক নয়। সে চিন্তা করে দেখল, কেটলিটার অনেক দাম হবে, সেটা এখন না কিনলেও চলবে। জলখাওয়ার ঘটিটায় চা ফুটিয়ে দু'চারদিন আপাতত চালানো যাবে। তা ছাড়া আলমারিতে দু'এক জোড়া বাড়তি কাপ-প্লেট আছে, সেটাও ঠেকবে না। আর অতিথি-অভ্যাগত যদি সেরকম বেশি আসে, আশেপাশের অফিসঘর থেকে এনে জল খাওয়ার কাঁচের গ্লাস দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যাবে। তবে সে সম্ভাবনা খুব কম, ঝড়ুলালের ঝাল-চা খাওয়ায় খদ্দের দেশে খুব বেশি নেই।

এখন সমস্যা শুধু উনুন নিয়ে। এই ভরদুপুরে বাজারে মাটির উনুন যে সব দোকানে পাওয়া যায়, সেগুলো নিশ্চয়ই খোলা নেই, দোকানদারেরা বাড়িতে খেতে গেছে। আর তা ছাড়া বাজারও মোটেই কাছে নয়। যেতে-আসতে, উনুন কেনাকাটা করে ফিরতে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণে রসময়বাবুর, ঝড়ুলালের মালিকের চা খাওয়ার সময় হয়ে যাবে। আর চা খাওয়ার সময় রসময়বাবু চা না পেলে খেপে যান।

ঝাড়ুদার ঝড়ুলাল খুবই চিন্তায় পড়ল।

অবশ্য একটা সহজ সমাধান আছে। সামনের রাস্তায় পানের দোকান আছে ঝড়ুলালের দেশোয়ালি ভাই শুকদেবের। শুকদেব নিজের রান্না নিজেই করে। এই রান্না করার জন্যে তার একটা কেরোসিনের ছোট জনতা স্টোভ আছে। শুকদেবের সঙ্গে ঝড়ুলালের যথেষ্টই ভাবভালবাসা রয়েছে।

চাইলে শুকদেব হয়তো জনতা স্টোভটা ঝড়ুলালকে কিছুক্ষণের জন্যে ধার দিতে পারে। এখন তো তার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে, পনেরো মিনিটের জন্যে স্টোভটা নিয়ে আসা যায়। যেটুকু কেরোসিন খরচ হবে,

pathagar.net

তার দামটা না হয় ধরে দেওয়া যায়।

কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। চিরদিন রসময়বাবুর ঝাল-চা তৈরি হয়ে এসেছে গল্প-কবিতা-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে। আজ যদি কেরোসিনের আগুনে সেই চা বানানো হয়, সে চায়ে কি স্বাদ হবে, সেই ঝাল-ঝাল ঝাঁঝালো ভাবটা আসবে?

অনেক চিন্তা করার পর ঝড়ুলাল একটা সিদ্ধান্ত নিল। চড়ুইভাতিতে যেমন হয়, সেইরকম ইটের তৈরি অস্থায়ী উনুনে চা করলেই পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে জল গরম করা যাবে। ধোঁয়ার গন্ধটাও বেশ জোরদার হবে চায়ের মধ্যে।

ইট আনতে যাওয়ার আগে ঝড়ুলাল একবার বর্তমান পরিস্থিতিটা বুঝে নিল। ঘরের মধ্যে এখনও দুই রাগী বুড়ো দাঁড়িয়ে। তবে তাদের এই মুহূর্তে আর তত মারাত্মক বা ভয়াবহ মনে হচ্ছে না।

সুড়ুত করে ঝড়ুলাল দুই বুড়োর পাশ কাটিয়ে বাইরের প্যাসেজে চলে গেল। সেখানে দেয়ালের গা ঘেঁষে বেশ কয়েকটা আদ্যিকালের শ্যাওলা-পড়া ইট আছে, বোধ হয় এই পুরনো বাড়িটা প্রথম যখন তৈরি হয়েছিল, সেই সময়কার।

সে যা হোক, গোটাকয়েক ইট বেছে নিয়ে তার থেকে দুটো-দুটো করে হাতে নিয়ে ঘরে আনতে গেল ঝড়ুলাল।

এদিকে দুটো থান-ইট হাতে ঝড়ুলালকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে রামশঙ্কর এবং হরগোবিন্দ দু'জনেই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন, সর্বনাশ, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এবার লোকটা থান-ইট মেরে একেবারে মাথা গুঁড়ো করে দেবে। এমনকী কালিয়া কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে আলমারির পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

ঝড়ুলাল অবশ্য এতসব খেয়াল করার পাত্র নয়। সে এক-একবারে দুটো-দুটো করে ইট বয়ে এনে যত্ন করে সাজিয়ে আগে যেখানে মাটির উনুনটা ছিল সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে ইটের উনুন বানাল।

হঠাৎ ভয় পেয়ে রামশঙ্কর আর হরগোবিন্দ বোকা বনে গিয়েছেন। তাঁরা যখন দেখলেন ইটগুলো তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে নয়, বরং তাঁরা যে-উনুনটা ভেঙে ফেলেছেন তারই বদলি উনুন বানানোর জন্যে,

pathagar.net

তখন দু'জনেই রীতিমত লজ্জিত হলেন।

নিজেদের এই লজ্জা এবং ভয়ের ভাবটা কাটানোর জন্যে হঠাৎ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই রামশঙ্করবাবু এবং হরগোবিন্দবাবু কাব্যালোচনা আরম্ভ করে দিলেন।

ঝড়ুলালের হাতে থান-ইট দেখে দু'জনেরই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। দু'জনেই আগের কথার খেই হারিয়ে ফেলেছেন।

তবে তাতে কিছু আসে যায় না। পদ্য বা কাব্য বিষয়ে এঁরা দু'জনেই অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের রচিত কবিতা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারেন।

আজ সকালেই হরগোবিন্দ পাল হ্যালির ধূমকেতুর বিষয়ে একটা পদ্য লিখেছেন। পদ্যটা লিখে তাঁর মনে খুব আনন্দ হয়েছে। গত কয়েকদিন মাঝরাতে উঠে তিনি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ময়দানে হেঁটে এসে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন হ্যালির ধূমকেতু পুবের আকাশে দেখার। দুঃখের বিষয়, আকাশ ঘোলাটে আর মেঘলা থাকায় কিছুই দেখতে পারেননি।

তাঁর সেই ধূমকেতু দেখতে না পারার দুঃখ হরগোবিন্দবাবু পদ্য লিখে মিটিয়েছেন। পদ্যটা সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছে :

কিসের হেতু আসছে কেতু,
কিসের হেতু লেগেছে ধুম,
কিসের হেতু জাগছি রাত,
কিসের হেতু নেইকো ঘুম ?

ধূমকেতুর ওপরে হরগোবিন্দবাবুর পদ্যটা শুনে খুব ভাল লাগল রামশঙ্করবাবুর, তাঁর খুবই আফসোস হতে লাগল, তিনিও হ্যালির ধূমকেতুর বিষয়ে একটা পদ্য লিখেছেন সেটা কেন আগে শোনালেন না। এখন শোনালে হরগোবিন্দ ভাববে হিংসে করে বলছে, কিংবা তাকে নকল করছে। তা ছাড়া খুব কাছেই সম্পাদক লোকটা দাঁড়িয়ে সব দেখছে।

এই মুহূর্তে রামশঙ্করবাবুর মনের মধ্যে একটা মহৎ কবিতার ভাব এসেছে। ভাবটা এখনও স্পষ্ট আকার ধারণ করেনি, কিন্তু বেশ একটা

আনন্দের আমেজ আছে এই কবিতাটায়। কবিতাটা আরম্ভই হয়েছে চমৎকারভাবে :

জুতোর বাক্সে পাখির ডিম,
দুপুরবেলা পড়ছে হিম।
অতঃ কিম ? অতঃ কিম্ ?

পরস্পর নিজের-নিজের কবিতা মুখস্থ বলে এবং দু'জনে দু'জনের কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে এই দুই রাগী বুড়ো ধীরে-ধীরে একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলেন।

বিশেষ করে যখন তাঁর একটা প্রিয় পুরনো কবিতা স্মরণ করলেন হরগোবিন্দ, তখন শুধু রামশঙ্করই নন, রসময়বাবুও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কবিতাটির নাম 'গন্ধ-গোকুল'। কবিতাটি গন্ধ নিয়ে লেখা, সুগন্ধের ব্যাপার দীর্ঘ পদ্য। সম্পূর্ণ পদ্যটি উল্লেখ করতে গেলে ঢের জায়গা লাগবে, শুধু একটু অংশ পড়লেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে :

বকুল বীথিতে নকুল।
এ-কূল এবং ও-কূল,
গন্ধে মেতেছে দু'কূল,
শুনেছ গন্ধ-গোকুল ?

[সাত]

ঝাল-চা

এদিকে পরিবেশ একটু শান্ত হয়ে এসেছে দেখে রসময়বাবু সমস্ত অবস্থাটা অনুধাবন করে ব্যাপারটা প্রশমিত করার জন্যে এই দুই বৃদ্ধ কবিকে তাঁর সম্পাদকীয় কক্ষে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, "আসুন, আসুন। আপনারা আমার ঘরে এসে চেয়ারে বসুন। এই ঝড়ুলাল, তাড়াতাড়ি চা বানা।"

হরিলালও সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে দু'জনকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে

সম্পাদকের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। সম্পাদকের সামনে চেয়ারে বসে হরগোবিন্দ একবার রামশঙ্করের দিকে, রামশঙ্কর একবার হরগোবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর রামশঙ্কর হরগোবিন্দকে বললেন, "তুই যেন কী একটা কবিতার কথা বললি ?"

হরগোবিন্দ বললেন, "কেন, তোর সেই জলাতঙ্কের কবিতাটা ?"

রামশঙ্করের মনে পড়ল বটে কবিতাটার কথা কিন্তু জলাতঙ্কের জায়গাটা কেমন যে, বোধহয় আজকের কুকুরের ব্যাপারটার জন্যেই, কেমন যেন কিছুতেই মনে আসছে না, কিন্তু তার পরের প্যারাগুলো বেশ মনে পড়ছে। তিনি জলাতঙ্কের অংশটুকু বাদ দিয়ে বলতে লাগলেন :

কার হবে আমবাত,
কার হবে যক্ষ্মা,
কর্কট রোগে ভুগে
তবু পাবে রক্ষা।
ভুগে ভুগে অম্বলে
ভুগে-ভুগে পিত্তে
কারও আর সুখটুখ
থাকবে না চিত্তে।

গড়গড় করে স্বরচিত কবিতা মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন রামশঙ্কর। সঙ্গে-সঙ্গে প্রভাবিত হয়ে হরগোবিন্দ শুরু করলেন :

উঁকির সঙ্গে ঝুঁকি
(যেমন) রোগার সঙ্গে রুগি
(যেমন) টোকার সঙ্গে টুকি
(যেমন) ঝোঁকার সঙ্গে ঝুঁকি
(যেমন) খোকার সঙ্গে খুকি
উঁকির সঙ্গে ঝুঁকি।

pathagar.net

তারপর হঠাৎ সুর বদলে রসময়ের দিকে মুচকি হেসে রামশঙ্করের পিঠে হাত রেখে হরগোবিন্দ হাসিমুখে বললেন :

যদি হয় সুজন।
উঁকিঝুঁকিতে দু'জন ॥

সম্পাদকের চেয়ারে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলেন রসময়বাবু। তিনি তাঁর দীর্ঘ সম্পাদকীয় জীবনে এমন দু'জন কবি একসঙ্গে দ্যাখেননি। এমন আশ্চর্য কবিতা শোনারও সৌভাগ্য তাঁর কখনও হয়নি। তাঁর সামনে যেন দুটি স্বর্ণখনি এবং হীরকখনির গুহাদ্বার খুলে গেছে, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ এবং আলিবাবার মোহর-ভাণ্ডার একসঙ্গে পেলে যে-কোনও মানুষের মনের অবস্থা হয়, এমন দু'জনকে একসঙ্গে পেয়ে উঁকিঝুঁকির সম্পাদকের তাই হল। তিনি বিচলিত, বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

হরগোবিন্দ তখন আবার বলে চলেছেন :

হরের সঙ্গে রামের দেখা,
হর বলেন, 'একা একা
ভাল লাগে তোমার ভাই ?'

রাম বলেন, 'একা একাই
ছিলাম বটে।
তোমাদের দেখা
পেলাম যেই, এখন একা
সত্যি সত্যি নই তো আর।'
হর বলেন, 'চমৎকার !
খুব আনন্দ হচ্ছে মনে
এই কথাটা এতক্ষণে
বুঝতে পেরে বুঝলে ভাই।'
রাম বলেন, 'তবে যাই,
আবার থাকো একা-একাই।'

এই শেষের জায়গাটায় রামশঙ্কর আবার উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন, "দ্যাখ্ হরে, সাবধান ! একটু আগে তুই আমাকে কালো কুকুর

pathagar.net

হরগোবিন্দ এবং রামশঙ্করের হল প্রানান্ত অবস্থা...

pathagar.net

বলেছিস। এখন আবার বলছিস স্বার্থপরের মতো তোকে একা ফেলে আমি চলে যাব। তুই ভেবেছিস কী ?"

আবার গোলমাল পাকাতে যাচ্ছিল। রসময়বাবু তাড়াতাড়ি দু'জনের মধ্যে পড়ে "করেন কী ? করেন কী ? আপনারা প্রবীণ কবি, আপনাদের কি এসব মানায় ?" এরকম নানা বাক্যব্যয়ে দু'জনকে প্রশমিত করেন। এই সুযোগে কায়দা করে দু'জনের নাম পরিচয় বিস্তারিত সব জেনেও নিয়েছেন।

কথাবার্তা প্রায় জমে এসেছে। এমন সময় ঝাল-চা, চা ঠিক নয়, চায়ের প্রস্তুতি, বিপত্তি ডেকে আনল।

ঝড়ুলালের তোলা উনুন থেকে পাঙুলিপি পোড়ানোর ধোঁয়া আর পোড়া লঙ্কার ঝাঁজে ক্রমশ উঁকিঝুঁকি অফিস এবং রসময়বাবুর দপ্তর আচ্ছন্ন হয়ে এল। ভেতরের বড় ঘর থেকে সর্বপ্রথমে রাস্তার কালো কুকুরটা হাঁচতে হাঁচতে রাস্তার দিকে ছুটে পালাল।

সর্বাত্মক হাঁচি-কাসি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল রামশঙ্কর, হরগোবিন্দ এবং রসময়ের মধ্যে। কোঁচার খুঁটে নাক-মুখ চেপে প্রায় দমবন্ধ হবার অবস্থা।

রসময়বাবুর তবু অভ্যেস আছে কিন্তু হরগোবিন্দ এবং রামশঙ্করের হল প্রাণান্ত অবস্থা। এই অবস্থায় ঝড়ুলাল তিন পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আজ অতিথিদের জন্যে বেশি ঝাল দেওয়া হয়েছে। ধূমায়িত সেই লাল চা কিছু না বুঝে দুই বন্ধু মুখে দিয়েই, 'ওরে বাবা রে' বলে চিৎকার করে উঠলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছাতা-ছড়ি, চায়ের পেয়ালা সব কিছু ফেলে পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে ছুটে রাস্তায় দৌড় লাগালেন।

কালো কুকুরটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে কী বুঝল বলা কঠিন। তবে সেও এঁদের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল।

রসময়বাবু এদিকে হরিলাল, ঝড়ুলালকে নির্দেশ দিয়েছেন, "হরিলাল, ঝড়ুলাল, কবিদের ধরো। ওরা চলে গেলে উঁকিঝুঁকি কাগজের মহা ক্ষতি হবে। ওদের ফেরাও।"

কিন্তু কে তাঁদের ফেরাবে। রামশঙ্কর আর হরগোবিন্দ তখন প্রাণ হাতে করে ছুটছেন। তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছে কালো কুকুরটা।

পরিশেষ

এ গল্পের শেষ নেই।

হরগোবিন্দ কিংবা রামশঙ্কর কেউই কবিতা রচনা করা ছাড়েননি। মুখে-মুখে এবং কাগজে-কলমে তাঁরা হরদম কাব্য রচনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আর কোনও কাগজে বা পত্র-পত্রিকায় কবিতা পাঠান না। তাঁরা বেশ বুঝে গেছেন, ব্যাপারটা মোটেই নিরাপদ নয়।

তবে এত কবিতা তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। শোনা যাচ্ছে, এঁরা নিজেরাই একটা কাগজ করবেন, সে কাগজে নিজেদের লেখা ছাড়াও অন্যদের লেখাও থাকবে। তবে লেখকদের লেখায় তাঁরা মোটেই হাত দেবেন না। কিংবা কোনও লেখককে কোনওদিন ঝাল-চা খাওয়াবেন না।

আর একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা না বলে শেষ করা উচিত হবে না। উঁকিঝুঁকি কাগজের সেই কালিয়া বলে কুকুরটা, সেটা রামশঙ্করবাবুর পিছে-পিছে চলে এসেছে। এখন তাঁর বাড়ির সামনের ফুটপাথে থাকে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধে রামশঙ্করবাবু যখন বেড়িয়ে বাড়ি ফেরেন, সে লেজ নাড়তে নাড়তে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর কোল বেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

যদি কোনওদিন হরগোবিন্দবাবু রামশঙ্করবাবুর ওখানে আসেন, তা হলে তাঁকে দেখেও সে লেজ নাড়ে, হরগোবিন্দবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন :

ওরে ওরে কেষ্টা
এত বড় দেশটা,
তুই কিনা শেষটা
ছেড়ে দিলি চেষ্টা।
যে যা বলে বলবে
তোর লেখা চলবে।
ওরে ওরে কেষ্টা,
ছাড়িস না চেষ্টা ॥

pathagar.net